উপকূলীয় বন ব্যবস্থাপনায়

আইন ও নীতির পর্যালোচনা

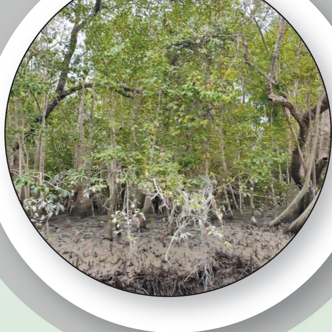

তাসলিমা ইসলাম
জাকিয়া সুলতানা

উপকূলীয় বন ব্যবস্থাপনায় আইন ও নীতির পর্যালোচনা

তাসলিমা ইসলাম
জাকিয়া সুলতানা

জুন, ২০২৬

প্রকাশক

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)

বাড়ি নং ১৫/এ (৫ম তলা), সড়ক নং ৩, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫
ফোন: (৮৮০-২) ৫৮৬১৪২৮৩, ৫৮৬১০৩১১
ইমেইল: bela@bangla.net, ওয়েবসাইট: belabangla.org

ডিজাইন বিন্যাস
নাজিমউদ্দিন প্রধান

ISBN-978-984-8173-34-3

মুদ্রণে: আগামী প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উপকূলীয় বনসহ দেশের সকল বন রক্ষায় ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান আইন ও নীতির পর্যালোচনা, সীমাবদ্ধতা, বন ধ্বংসের বর্তমান চিত্র এবং বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে করণীয় সংক্রান্ত সুপারিশমালা নীতি-নির্ধারক ও পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)'র এ প্রকাশনা। প্রকাশনাটির প্রুফ দেখে, ছবি ও তথ্য দিয়ে বেলা'র সহকর্মীগণ, স্থানীয় সম্প্রদায় ও অংশীজনদের মধ্যে যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন বেলা তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

প্রকাশনাটি পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত ও সুপারিশ প্রদান এবং অর্থায়নের জন্য অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ এর কাছে বেলা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সকলের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের সফলতা নির্ভর করছে প্রকাশনাটির পাঠক গ্রহণযোগ্যতার উপর। বেলা আশা করে সম্মানীত পাঠকগণ বইটিকে তথ্যবহুল ও প্রয়োজনীয় বিবেচনা করবেন।

তাসলিমা ইসলাম
প্রধান সমন্বয়কারী
ও
জাকিয়া সুলতানা
আইনজীবী

সার-সংক্ষেপ

দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের আবাসভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এবং মানুষের জীবন জীবিকা সুরক্ষায় বনভূমির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় এলাকাকে রক্ষা করতেও বনভূমি রক্ষা ও পুনরুদ্ধার জরুরি। দেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক বনের মধ্যে পাহাড়ি, সমতলের শাল এবং ম্যানগ্রোভ বন অন্যতম। এ তিন ধরনের বন ছাড়াও হাওর এলাকায় সোয়াম্প ফরেস্ট বা জলাভূমির বন হিসেবে আরও এক ধরনের বন রয়েছে। বন ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আইনে এসব বনকে সংরক্ষিত, রক্ষিত, ৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত, অশ্রেণিভুক্ত এবং অর্জিত-অর্পিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে যেসব কর্মসূচির অধীন বন ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক বনায়ন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। সর্বজনস্বীকৃত যে, একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে দেশের মোট ভূমির ২৫% বনভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ বন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী তা আছে মাত্র ১৫.৫৮%। বনের এ পরিমাণ নিয়ে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পরিসংখ্যান। বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী বন রয়েছে মোট ভূমির ১৪.৫[১]%। বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র ২০১৬-২০৩১ অনুযায়ী দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ মোটভূমির প্রায় ১৭.৪%। মনুষ্যসৃষ্ট কর্মকাণ্ড ও বন বিধ্বংসী সিদ্ধান্তের কারণে উপকূলীয় বনসহ দেশের সকল বনভূমি আজ ধ্বংসের মুখে। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে স্বল্প পরিমাণে বিদ্যমান এ বন ধ্বংস ও উজাড়ের হারও কম নয় এ দেশে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর বিবৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশে বার্ষিক বন উজাড়ের হার ২.৬ শতাংশ যা বিশ্বব্যাপী বন উজাড়ের গড়ের হারের দ্বিগুণ[২]। গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ-এর ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে দেশে প্রাকৃতিক বন উজাড় হয়েছে মোট ১৮,০০০ হেক্টর যার ক্ষতির পরিমাণ ৯.৮ মেগাটন কার্বন নিংসরণের সমান[৩]। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তথ্যমতে, ২০০২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে প্রাকৃতিক বন কমেছে ৮,৯০০

[১] https://data.worldbank.org/country/bangladesh

[২] The Daily Star title "International Forest Day: Annual deforestation rate in Bangladesh almost double the global average, TIB report says"; 21 March 2021

[৩] https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/BGD/?category=forest-change

হেক্টর এবং ২০০১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ কমেছে প্রায় ২৪৬,০০০ হেক্টর বা ১৩ শতাংশ। এ পরিমাণ বৃক্ষাচ্ছাদন রক্ষা করা গেলে অন্তত ১৫০ মেগাটন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঠেকানো যেত। এসব বন ধ্বংসের মূলে রয়েছে বৃটিশ সরকারের রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রণীত বন আইন; বনের পরিমাণ ও সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা; অসামঞ্জস্যপূর্ণ বন নীতি; সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনিয়ম ও অদক্ষতা; বন ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করা; বনভূমির বিরুদ্ধ ব্যবহার এবং ভ্রান্ত ও বিতর্কিত বনায়ন কর্মসূচি। ধ্বংসের মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাচ্ছে না উপকূলীয় প্রাকৃতিক বন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সৃজিত গ্রিন বেল্ট বা উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী। দেশে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ২৫ বছরে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৫০ শতাংশেরও বেশি ঝাউবন উজাড় হয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরে চিংড়িঘের নির্মাণের জন্য ৬ হাজার একর প্যারাবন ধ্বংস করা হয়েছে[৪]। মার্চ, ২০২৪ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত চারমাসে সোনাদিয়ার তিন হাজার একর প্যারাবন ধ্বংস করে চিংড়িঘের নির্মাণ করা হয়েছে[৫]। সোনাদিয়া ও ঘটিভাঙা মৌজার আট হাজার একর প্যারাবন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে[৬]। সরকার ইতোমধ্যে উপকূলীয় বনসহ দেশের সকল ধরনের বন রক্ষায় বিভিন্ন নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং আইন প্রণয়ন করেছে। বন রক্ষায় প্রণীত এসব নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং আইন পর্যালোচনা করা হয়েছে এ প্রকাশনার মাধ্যমে।

উপকূলীয় বনসহ দেশের সকল বনভূমি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের স্বার্থে **বেলা** বন রক্ষায় প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও আইনসমূহ পর্যালোচনা এবং সেকেন্ডারি তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ প্রকাশনা প্রস্তুত করেছে যার মূল লক্ষ্য আইনি কাঠামো সংস্কার এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক বনভূমি সংরক্ষণ করা ও ফিরিয়ে আনা।

বেলা'র এ প্রকাশনায় দেশের প্রাকৃতিক বনসমূহের পরিচিতি, বনের আইনি শ্রেণিবিভাগ, বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা ও আইন, বন ধ্বংসের চিত্র এবং বন রক্ষায় করণীয় বিষয়ে আলোচনা ও কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা

---

[৪] আপত্তি-প্রতিবাদ উপেক্ষা, মহেশখালীতে প্যারাবন উজাড় করে নির্মিত হচ্ছে নতুন জেটি; প্রথম আলো; ২১ মে, ২০২৪

[৫] Save Sonadia Island's mangrove forests; thedailystar.net; May 30, 2025

[৬] স্মারক নং- ২২.০১.০০০০.৭৬২.২৮.০০.২০২৪.১৪১; তারিখ : ২৭/০৬/২০২৪; উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম

হয়েছে। এটি প্রস্তুতকালে উপকূলীয় এলাকাবাসীর সাথে দফায় দফায় আলোচনা করা হয়েছে এবং চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে উপকূলীয় বন রক্ষায় সফল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে উপকূলবাসীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং বননির্ভর জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।

উপকূলীয় বনসহ দেশের সকল বন রক্ষায় বিদ্যমান আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা ও সঠিক বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দিক নির্দেশনা পেতে বেলা'র এ প্রকাশনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে।

তাসলিমা ইসলাম
প্রধান সমন্বয়কারী
ও
জাকিয়া সুলতানা
আইনজীবী

ঝাউ বন (সৃজিত উপকূলীয় বন)

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

সার-সংক্ষেপ v

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশের বনভূমি

১.১ বন পরিচিতি ও পরিমাণ ১

পাহাড়ি বন ৫

শালবন ৬

জলাভূমির বন ৬

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন) ৭

সৃজিত উপকূলীয় বন ৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : বনের আইনি শ্রেণিবিভাগ

২.১ বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিভিত্তিক বনভূমি ৯

২.১.১ সংরক্ষিত বনভূমি ৯

২.১.২ ৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত বন ১০

২.১.৩ রক্ষিত বন ১০

২.১.৪ অর্পিত বা অর্জিত বন ১০

২.১.৫ অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন ১১

২.১.৬ অন্যান্য বন ১১

তৃতীয় অধ্যায় : বন ব্যবস্থাপনা

৩.১ বন ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশ ১৫

৩.২ বন ব্যবস্থাপনার আইনি কাঠামো ১৬

৩.২.১ নীতিমালাসমূহ ১৭

৩.২.২ পরিকল্পনাসমূহ ২৬

৩.২.৩ আইন ও বিধিমালাসমূহ ২৮
৩.৩ প্রচলিত বন ব্যবস্থাপনা ৫০
৩.৪ উপকূলীয় বন রক্ষায় আদালতের নির্দেশ ৫৩

চতুর্থ অধ্যায় : বন ধ্বংসের বাস্তব চিত্র
৪.১ আইন ও বাস্তবতা ৫৫
৪.২ বন রক্ষায় করণীয় ৬২

শেষকথা ৬৫

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশের বনভূমি

১.১ বন পরিচিতি ও পরিমাণ

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এ দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ বন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জিডিপিতে বন খাতের অবদান ছিল ১.৭৪ শতাংশ। বন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৩,০০,০০০ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ১৫.৫৮ শতাংশ। যারমধ্যে প্রায় ১৮,৮০,৪৯৩.৭৩ হেক্টর বন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে দেশে বিভিন্ন রকমের বন রয়েছে। এসব বনের মধ্যে পাহাড়ি, সমতলের শাল এবং ম্যানগ্রোভ (প্রাকৃতিক ও সৃজিত) বন অন্যতম। এ তিন ধরনের বন ছাড়াও হাওর এলাকায় সোয়াম্প ফরেস্ট বা জলাভূমির বন হিসেবে আরও এক ধরনের বন রয়েছে।

এক নজরে বাংলাদেশের বনভূমি[১]

শ্রেণি	বনভূমির পরিমাণ	অবস্থান	জীববৈচিত্র্য
পাহাড়ি বন	প্রায় ১৩,৭৭,০০০ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৯.৩৩ শতাংশ।	চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং পার্বত্য জেলাসমূহে।	**উদ্ভিদ** গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম, বাঁশ ও বেত।

[১] বার্ষিক প্রতিবেদন; ২০২২-২৩ অর্থবছর; বন অধিদপ্তর

শ্রেণি	বনভূমির পরিমাণ	অবস্থান	জীববৈচিত্র্য
			প্রাণী হাতি, বন্যশুকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই, ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না।
শালবন	১,২০,০০০ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ০.৮১ শতাংশ।	কুমিল্লা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর, দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলাসমূহে।	**উদ্ভিদ** মূল প্রজাতি শাল যা গজারি নামেও পরিচিত। অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে হরিতকি, বহেরা, শিমুল, কড়ই, অর্জুন উল্লেখযোগ্য। **প্রাণী** মেছোবাঘ, বনবিড়াল, বানর, শিয়াল, সাপ, পাখি।
জলাভূমির বন	রাতারগুল জলাভূমির বন ২০৪.২৫ হেক্টর। এ বন বর্ষাকালে প্রায় ২০ থেকে ৩০ ফুট পানির নিচে ডুবে যায় যা এটিকে একটি অনন্য জলাভূমিতে পরিণত করে। স্থানীয়ভাবে এটি ‘বাংলাদেশের আমাজন’ হিসেবে পরিচিত	সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় ও বিল। তবে, রাতারগুল দেশের প্রধান জলাভূমির বন।	**উদ্ভিদ** হিজল, করচ, পিটালী, বরুন। **প্রাণী** বানর, মেছোবাঘ, ভোঁদড়, কাঠবিড়ালী, সাপ, পাখি।

শ্রেণি	বনভূমির পরিমাণ	অবস্থান	জীববৈচিত্র্য
ম্যানগ্রোভ বন প্রাকৃতিক ও সৃজিত দুই ধরনের ম্যানগ্রোভ বন মিলিয়ে দেশের মোট ম্যানগ্রোভ বনের পরিমাণ ৮,৫৩,১০২ হেক্টর যা বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনের ৪০ শতাংশ।			
শ্রেণি	**বনভূমির পরিমাণ**	**অবস্থান**	**জীববৈচিত্র্য**
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন অন্যতম)	পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের মোট আয়তন ৬,০১,৭০০ হেক্টর যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.০৭ শতাংশ। জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বিধায় ১৯৯২ সালে সুন্দরবন ৫৬০তম রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে[২]। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনের ১,৩৯,৭০০ হেক্টর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এলাকাকে ৭৯৮তম বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে[৩]।	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কক্সবাজার জেলাসমূহে।	**উদ্ভিদ** সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, গরান, বাইন, কাঁকড়া, কেওড়া, ঝাউ। **প্রাণী** রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, রেসাস বানর, বনবিড়াল, সজারু, উদ বিড়াল, বন্যশুকর, কুমির, রাজগোখরা, অজগর, কেউটে এবং কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ।

[২] Bangladesh Sundarbans Delta Vision, 2050

[৩] https://whc.unesco.org/en/list/798/

শ্রেণি	বনভূমির পরিমাণ	অবস্থান	জীববৈচিত্র্য
সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন	২,৫১,৪০২ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ১.৬২৫%[৪]।	নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকাসমূহ। মূলত উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর ভূমিতে এ বন সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এ বনকে প্যারাবনও বলা হয়। বন অধিদপ্তরের তথ্য মতে, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা নতুন চরে ১৯৬৬ সাল থেকে ম্যানগ্রোভ বনায়ন শুরু হলেও দক্ষিণ এবং পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলকে জলোচ্ছ্বাস ও উপকূলীয় ভাঙন থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পরে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।	**উদ্ভিদ** ঝাউ, ছৈলা, বাইন, কেওড়া, গোলপাতা **প্রাণী** এশীয় বন্য হাতি, বানর, হরিণ, বন্য শূকর, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ও পাখি, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ

[৪] বন অধিদপ্তর; বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

পাহাড়ি বন

চিত্র-১: পাহাড়ি বন

শালবন

চিত্র-২: মধুপুর শালবন

জলাভূমির বন

চিত্র-৩: রাতারগুল জলাভূমির বন

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

চিত্র-৪: সুন্দরবন

চিত্র-৫: সুন্দরবন

সৃজিত উপকূলীয় বন

চিত্র-৬: ঝাউ বন (সৃজিত উপকূলীয় বন)

দ্বিতীয় অধ্যায়
বনের আইনি শ্রেণিবিভাগ

২.১ বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিভিত্তিক বনভূমি

আইনগত বিবেচনায় বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকা বনভূমিকে সংরক্ষিত, ৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত, রক্ষিত, অর্পিত/অর্জিত এবং অশ্রেণিভুক্ত বন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

শ্রেণিভিত্তিক বনভূমির পরিমাণ[৫]

ক্র. নং	বনের ধরন	বনভূমির পরিমাণ
১	সংরক্ষিত বন	৩৩,১০,৯০৭.৫২ একর (১৩,৩৯,৯০৫.৯২ হেক্টর)
২	৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত বন	১১,৭২,৯৭১.৭৫ একর (৪,৭৪,৬৯৫.১৬ হেক্টর)
৩	রক্ষিত বন	৯১,৩৮১.৮৯ একর (৩৬,৯৮১.৭৪ হেক্টর)
৪	অর্জিত/অর্পিত বন	২৮,৫৯১.৩৪ একর (১১,৫৭০.৭৬ হেক্টর)
৫	অশ্রেণিভুক্ত বন	৪২,৮৪৭.৫১ একর (১৭,৩৪০.১৫ হেক্টর)
	মোট বনভূমির পরিমাণ	৪৬,৪৬,৭০০.০১ একর (১৮,৮০,৪৯৩.৭৩ হেক্টর)

২.১.১ সংরক্ষিত বনভূমি

বন আইন, ১৯২৭-এর ২০ ধারার ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক ঘোষিত যেকোন বনভূমি বা পতিতভূমি বা যেকোন ভূমি যা বনায়নের উপযোগী তাই সংরক্ষিত

[৫] বন অধিদপ্তর; বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

বনভূমি। বন অধিদপ্তরের তথ্যমতে সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ৩৩,১০,৯০৭.৫২ একর[৬]।

২.১.২ ৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত বন

বন আইনের ২০ ধারায় সংরক্ষিত বন ঘোষণার উদ্দেশ্যে ৪ ও ৬ ধারায় প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়ে থাকে। ৪ ধারার বিধান মোতাবেক সরকার কোন ভূমি সংরক্ষিত বন ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করবে যেখানে উক্ত ভূমির অবস্থান ও সীমানা নির্দিষ্ট থাকবে। প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লেখিত ভূমির সীমানার মধ্যে বা বনভূমিতে বা বনজ দ্রব্যের উপর কোন ব্যক্তির অধিকারের অস্তিত্ব নির্ধারণ ও তদন্ত করার জন্য সরকার একজন ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়োগ করবে। ৪ ধারায় প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকে ৩-৪ মাসের মধ্যে প্রজ্ঞাপিত ভূমিতে বিদ্যমান দাবি লিখিত আকারে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট দাখিলের ঘোষণা দিয়ে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ৬ ধারায় প্রজ্ঞাপন জারি করবেন। বন অধিদপ্তরের তথ্য মতে, অদ্যাবধি ৪ ও ৬ ধারায় ঘোষিত বনের পরিমাণ ১১,৭২,৯৭১.৭৫ একর।

২.১.৩ রক্ষিত বন

বন আইন, ১৯২৭-এর ২৯ ধারার বিধান মোতাবেক ঘোষিত যেকোন সরকারি বনভূমি যা সংরক্ষিত নয় তা রক্ষিত বন। বন অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট রক্ষিত বনের পরিমাণ ৯১,৩৮১.৮৯ একর।

২.১.৪ অর্পিত/অর্জিত বন

সাধারণত রাষ্ট্রীয় ভূমি ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী জমিদারদের নিকট থেকে অধিগ্রহণের মাধ্যমে বা অন্য যেকোনভাবে অধিগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত কোন বনকে অর্জিত বা অর্পিত বন বলা হয়ে থাকে। এ ধরণের বন সংরক্ষিত, রক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত বা ন্যস্ত বন নয় বরং প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত বন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী দেশে অর্জিত বনভূমির পরিমাণ ২৮,৫৯১.৩৪ একর। এরূপ বনভূমির অবস্থান মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, রংপুর, নীলফামারী এবং নওগাঁ জেলাসমূহে।

---

[৬] বন অধিদপ্তর; বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

২.১.৫ অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন

অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন বলতে এমন শ্রেণির বনকে বোঝায় যা সংরক্ষিত, রক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত বা ন্যস্ত বন হিসেবে প্রজ্ঞাপিত নয়। বন অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী অশ্রেণিভুক্ত বনের পরিমাণ ৪২,৮৪৭.৫১ একর যা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলাসমূহে অবস্থিত।

২.১.৬ অন্যান্য বন

উল্লেখিত শ্রেণি ছাড়াও বিভিন্ন আইনে নিম্নোক্ত আরও কিছু বনের পরিচয় পাওয়া যায়,

সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট বন[৭]

২০০০ সালে সরকার বন আইন, ১৯২৭ সংশোধনের মাধ্যমে ২৮(ক) ও ২৮(খ) ধারা সংযোজন করে সামাজিক বনায়ন বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। আইনের এ ধারার ক্ষমতা বলে ২০০৪ সালে প্রথম সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী দেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। সামাজিক বনায়ন মূলত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, বন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অধীনে, সরকার কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত লভ্যাংশের বিনিময়ে এবং বন বিভাগ কর্তৃক মনোনীত কিছু সংখ্যক উপকারভোগীর গাছ লাগানো কর্মসূচি। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি কাঠ বা বনজ দ্রব্যভিত্তিক। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রোপিত বৃক্ষ সাধারণত বনের প্রাকৃতিক প্রজাতির হয় না বরং দ্রুতবর্ধনশীল ভিন্ন ও বাণিজ্যিক প্রজাতির যা মেয়াদান্তে কেটে ফেলা হয়। দেশে সামাজিক বনায়নের মোড়কে কয়েক রকম বনায়ন দেখা যায়, যেমন-(ক) কৃষি বনায়ন, (খ) রাস্তা ও নদীনালার ধারে বনায়ন, (গ) বসতবাড়ির চারপাশে বনায়ন এবং (ঘ) উডলট বনায়ন।

ব্যক্তিগত বন[৮]

ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯ অনুযায়ী ব্যক্তিগত বন হচ্ছে সেই বন যা সরকারের সম্পত্তি নয় এবং যার মালিকানাও সরকারের নয়। ব্যক্তিমালিকানায় যদি কোন বন গড়ে ওঠে বা বন সৃষ্টি করা যায় এমন কোন পতিত জমি থাকে তবে তা ব্যক্তিগত বন হিসেবে সার্ভে রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার যদি মনে

---

৭ Hasan Rizwana, "বন, বনবাসী ও বন্য প্রাণী রক্ষায় আইনসমূহ"

৮ Hasan Rizwana, "বন, বনবাসী ও বন্য প্রাণী রক্ষায় আইনসমূহ"

করে বনটি সংরক্ষণ বা রক্ষা করা প্রয়োজন তবে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বনটির নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে। আবার যদি ব্যক্তিগত বনটির অবস্থান সরকারের সংরক্ষিত বা রক্ষিত বনের সন্নিকটে হয় তবে ব্যক্তিগত বনকেও সংরক্ষিত বা রক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। তবে, এর মালিকানায় কোন পরিবর্তন হবে না।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯-এ ব্যক্তিগত বনের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশে কোন ব্যক্তিগত বন নেই। কেননা রাষ্ট্রীয় ভূমি ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী বন হিসেবে রেকর্ডকৃত সকল ভূমির মালিকানা সরকারের উপর ন্যস্ত।[৯]

নিয়ন্ত্রিত বন[১০]

নিয়ন্ত্রিত বন বলতে ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯-এর ৩ থেকে ৬৩ ধারার বিধান অনুযায়ী বনভূমি সংরক্ষণ বা বনায়নের উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা ব্যক্তিমালিকানাধীন কোন বন বা বনভূমিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে সরকার একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমির প্রকৃত মালিক উল্লিখিত বনের ব্যবস্থাপনা করবে। তবে কোন মালিক যদি কর্মপরিকল্পনার শর্ত ভঙ্গ করে তখন এ বনভূমি ন্যস্ত বনভূমিতে পরিণত হবে। এক্ষেত্রে কেবল নিয়ন্ত্রণটা সরকারের হাতে থাকবে, কিন্তু মালিকানার কোন পরিবর্তন হবে না।

ন্যস্ত বন[১১]

ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত বনের মালিক যদি কর্মপরিকল্পনার শর্ত ভঙ্গ করে এবং বনটি সংরক্ষণে ব্যর্থ হয় তবে নিয়ন্ত্রিত বনটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোন আঞ্চলিক বন কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করা যায়, যা ন্যস্ত বন হিসাবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে বনের নিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে বনের নিয়ন্ত্রণ মূল মালিকের কাছে চলে যায়। এছাড়া কোন আঞ্চলিক বন কর্মকর্তা যদি রিপোর্ট করে যে কোন পতিত

---

[৯] রাষ্ট্রীয় ভূমি ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০; ধারা ২০(২ক)(ই)

[১০] Hasan Rizwana, “বন, বনবাসী ও বন্য প্রাণী রক্ষায় আইনসমূহ”

[১১] Hasan Rizwana, “বন, বনবাসী ও বন্য প্রাণী রক্ষায় আইনসমূহ”

জমি তিন বছর যাবৎ অনাবাদি অবস্থায় আছে এবং তা বনায়নের উপযোগী তবে সরকার সেই বনভূমিকেও ন্যস্ত বন হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে[১২]।

গ্রামবন[১৩]

গ্রামবন বলতে বোঝায় বন আইন, ১৯২৭-এর ২৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ঘোষিত কোন বন। এ ধারায় কোন সংরক্ষিত বনের উপর সরকারের কর্তৃত্ব বা অধিকার কোন গ্রাম সম্প্রদায়কে অর্পণ করার বিধান রাখা হয়েছে। এরূপ অধিকার হস্তান্তর করা হলে গ্রাম সম্প্রদায় উক্ত বন ব্যবস্থাপনা করবে। সরকার এ বন ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করবে এবং প্রণীত বিধিতে বনের উপর গ্রাম সম্প্রদায়ের অধিকার ও বন রক্ষায় তাদের কর্তব্যের উল্লেখ থাকবে। মূলত জীবন ও জীবিকার স্বার্থে প্রথাগতভাবে বনের উপর নির্ভরশীল এমন গ্রাম সম্প্রদায়কে রক্ষা করতেই আইনের এ বিধান।

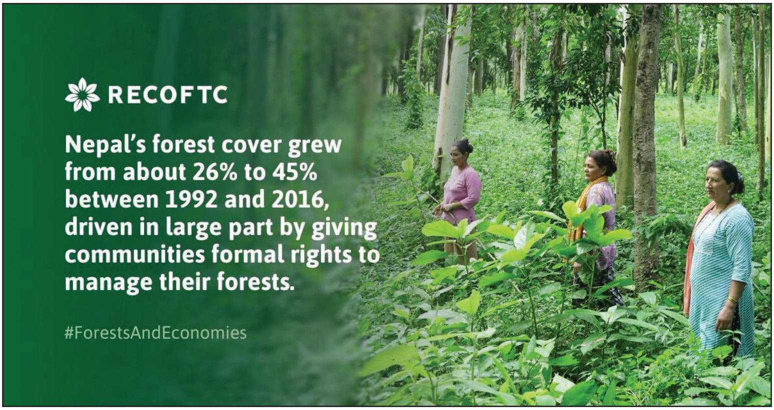

নেপালের কমিউনিটি বন (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও বন বিভাগ এখনও কোন বনকে গ্রামবন হিসেবে ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেনি। বন আইন প্রবর্তনের প্রায় শত বছর অতিবাহিত হলেও ২৮ ধারা অনুযায়ী গ্রামবন বিধিমালা এখনও প্রণয়ন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, বন আইনের এ ধারার অধীন ভারত গ্রামবন বিধিমালা

---

[১২] ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯; ধারা ১১

[১৩] Hasan Rizwana, "বন, বনবাসী ও বন্য প্রাণী রক্ষায় আইনসমূহ"

প্রণয়ন করে সে মোতাবেক বন ব্যবস্থাপনায় সফলতা পেয়েছে। একই আদলে হারিয়ে যাওয়া বন ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কমিউনিটি বন ব্যবস্থাপনা সফলতা পেয়েছে নেপালে। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে নেপালে বন উজাড়ের পরিমাণ ছিল ১০.৭%। আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে এভাবে উজাড় হতে থাকলে ১৯৯৫ সালের মধ্যে নেপাল বন শূন্য হয়ে পড়বে। বন উজাড় রোধ করতে নেপাল সরকার ১৯৯৩ সালে নতুন বন আইন এবং ১৯৯৫ সালে বন রেগুলেশন প্রণয়ন করে। এ আইন এবং রেগুলেশনে স্পষ্ট বিধান করা হয় যে গ্রামীণ সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবস্থাপনার উপযোগী সকল বন কেবল মাত্র 'কমিউনিটি বন' হিসেবেই ব্যবস্থাপনা করা হবে। দেশের ক্ষয়িত বন ফিরিয়ে আনতে তাই গ্রামবনের কোনো বিকল্প নেই। প্রাকৃতিক বন রক্ষায় ও ক্ষয়িত বন ফিরিয়ে আনতে কালক্ষেপন না করে গ্রামবন বিধিমালা প্রণয়ন বর্তমান সময়ের দাবি।

তৃতীয় অধ্যায়
বন ব্যবস্থাপনা

৩.১ বন ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশ[১৪]

বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। বন বিভাগের তথ্যমতে, ১৮৬২ সাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮৬৪ সালে জার্মান ফরেস্টার স্যার ডিয়েট্রিচ ব্রান্ডিস এর নেতৃত্বে "ইন্ডিয়ান ইম্পোরিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস" গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৬৬ সালে বেঙ্গল প্রদেশে বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ সালে উইলিয়াম এম স্লিচ বাংলার বন সংরক্ষক হিসেবে যোগদানের পর ঢাকা, চট্টগ্রাম, ভাগলপুর, আসাম ও কোচবিহার নামক ৫টি বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত কুচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ) ও চট্টগ্রাম (পূর্ববঙ্গ) ফরেস্ট ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে ১২০ বর্গমাইল এলাকা সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৭৫ সালে যশোর জেলার সুন্দরবনের ৮৮৫ বর্গমাইল এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং বেঙ্গল ফরেস্ট ডিভিশনের সংখ্যা দুইটি থেকে পাঁচটিতে উন্নীত করা হয় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পালামৌ, চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবন ফরেস্ট ডিভিশন)। সংরক্ষিত বনের পরিমাণ ১২০ বর্গমাইল থেকে ১৪৬৭ বর্গমাইল করে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

ভারতবর্ষের বিভক্তির পর ইম্পেরিয়াল (পরে সুপিরিয়র) ফরেস্ট সার্ভিসের পরিবর্তে ইস্ট পাকিস্তান (প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল) সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয় এবং পরে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক বন বিভাগ (প্রভিন্সিয়াল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট) গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক বন বিভাগের অধীনে তিনটি ফরেস্ট সার্কেল (পূর্ব সার্কেল, পশ্চিম সার্কেল ও উন্নয়ন সার্কেল) গঠিত হয়। এরমধ্যে চট্টগ্রাম ফরেস্ট ডিভিশন, কক্সবাজার ফরেস্ট ডিভিশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ফরেস্ট ডিভিশন ও সিলেট ফরেস্ট ডিভিশন পূর্ব সার্কেলের; সুন্দরবন ফরেস্ট ডিভিশন, ঢাকা ফরেস্ট ডিভিশন ও ময়মনসিংহ ফরেস্ট ডিভিশন পশ্চিম সার্কেলের এবং

---

[১৪] বন ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশ বন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট থেকে সংগৃহিত

ওয়ার্কিং প্ল্যান ডিভিশন ও ইউটিলাইজেশন উন্নয়ন সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রধান বন সংরক্ষকের পদ সৃজন করা হয়। ১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার রুল' প্রবর্তন হওয়ায় 'বাংলাদেশ সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস'কে (বিসিএস-বন) ক্যাডারভুক্ত করা হয় এবং বন বিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন থেকে যায়। ১৯৮৯ সালে 'পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়' সৃষ্টির পর বন বিভাগ এ মন্ত্রণালয়ের অধীন চলে আসে।

বন বিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন থাকাকালীন দক্ষিণ এবং পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলকে জলোচ্ছ্বাস ও উপকূলীয় ভাঙন থেকে রক্ষার লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকাসমূহে নতুন জেগে ওঠা চরগুলোতে 'গ্রিনবেল্ট' তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম উপকূলীয় বনায়ন তথা ম্যানগ্রোভ বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৪ অনুসারে সুন্দরবনের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে মোট ৮০০৬২.১৪৪ একর (৩২,৪০০ হেক্টর) এলাকা নিয়ে তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৯ সালে প্রথম জাতীয় বন নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন গুরুত্ব পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ৫টি জেলা নিয়ে রংপুর, ২টি জেলা নিয়ে পাবনা, ৩টি জেলা নিয়ে বগুড়া, ৩টি জেলা নিয়ে কুষ্টিয়া এবং ৫টি জেলা নিয়ে ফরিদপুরে সামাজিক বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য ঢাকা, যশোর ও বগুড়া সামাজিক বন সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়। বন নীতি সংশোধন করে ১৯৯৪ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ বন নীতি ঘোষণা করা হয়। এ নীতিমালার আলোকে সামাজিক বনায়ন ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং প্রাকৃতিক বনে এটি সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন নামক বন ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতে থাকে। সামাজিক বনায়ন বন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও বন বিভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা নামক আরও একটি বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে এবং বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২[১৫] এর মাধ্যমে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করে।

৩.২ বন ব্যবস্থাপনার আইনি কাঠামো

বন ও বনজ সম্পদ রক্ষা ও বন ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিভিন্ন সময় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন পরিকল্পনা। বাংলাদেশ স্বাক্ষর

[১৫] ২০২৬ সালে আইনটি রহিত করে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়

করেছে বন রক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে। ১৮৬৫ সালে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট এক্ট শিরোনামে সর্বপ্রথম বন আইন প্রবর্তন করা হয় যা পরবর্তীতে পরিমার্জনপূর্বক বন আইন, ১৯২৭ এ রূপান্তর করা হয়। প্রথম বন নীতি প্রণীত হয় ১৯৭৯ সালে যা সংশোধন করে ১৯৯৪ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ বন নীতি ঘোষণা করা হয় এবং ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকার এ বন নীতিতে আমূল পরিবর্তন এনে একটি সংরক্ষণধর্মী ও যুগোপযোগী বন নীতি ঘোষণা করে। অধিকন্তু বন রক্ষায় সরকারের রয়েছে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি। ২০১১ সালে সংবিধানে ১৮ক ধারা সংযোজনের মাধ্যমে বনভূমি রক্ষাকে রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে। নিম্নে বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

৩.২.১ নীতিমালাসমূহ

জাতীয় বন নীতি, ২০২৫

দেশে সর্বপ্রথম বন নীতি প্রণয়ন করা হয় ১৯৭৯ সালে যা পরবর্তীতে সংশোধন করে জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়। দেশের বনজ সম্পদের দ্রুত অবক্ষয়ের বিষয়টি বিবেচনায় এনে ১৯৯৪ সালের বননীতি প্রণয়ন করা হয়।

বন নীতির প্রারম্ভে দেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনায় সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণের

নীতিমালাসমূহ

- জাতীয় বন নীতি, ২০২৫
- জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮
- জাতীয় পানি নীতিমালা, ১৯৯৯
- জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১
- জাতীয় এনার্জি নীতিমালা, ২০০৪
- উপকূলীয় জোন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৫
- জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০
- পাথর ভাঙা নীতিমালা, ২০১৩
- জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫
- অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালা, ২০১৫
- পরিবেশ নীতিমালা, ২০১৮
- জাতীয় কৃষি নীতিমালা, ২০১৮
- সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা, ২০২২

ইতিবাচক কথা বলা হলেও ঘোষণাসমূহে বনায়নের যে প্রস্তাবনা তা ছিল বাণিজ্যিক ও মুনাফাভিত্তিক[১৬]। আবার ক্ষয়িত প্রাকৃতিক বন ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বনায়নের উপর জোর দেয়া হলেও[১৭], কেবল স্থানীয় পরিবেশ ও বন্যপ্রাণীর উপযোগী বনায়ন কার্যক্রম বিবেচনা করা হবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। এ বন নীতিতে প্রাকৃতিক বন রক্ষায় ও পুনরুদ্ধারে এবং প্রথাগত বনবাসীদের বিষয়ে যে ঘোষণা ছিল তা জনমত ও বাস্তবতা বর্জিত বিধায় ১৯৯৪ সালের বন নীতি যুগোপযোগী করে অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় বন নীতি, ২০২৫ প্রণয়ন করেছে যার মূল লক্ষ্য বন ব্যবস্থাপনাকে সংরক্ষণমুখী ও আধুনিকায়ন করা এবং বন, বাস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বন সম্প্রসারণ, বনসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা জোরদার করা।

১০টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত এ নীতিমালার উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান বন, বনভূমি, বন বাস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদ সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা; অবক্ষয়িত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনরুদ্ধার করা; দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২০৩৫ সালের মধ্যে ২৭% এ উন্নীত করা; বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারি সংগঠন এবং তরুণদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী, জীববৈচিত্র্যবান্ধব স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণ উৎসাহিত করা; আগ্রাসি প্রজাতির বৃক্ষরোপণ ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বনভূমির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা; বননির্ভর জনগোষ্ঠীর বন অধিকার ও প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান, বন ব্যবস্থাপনায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রয়োজনে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করা। দেশের উপকূলীয় বন সম্পর্কে এ নীতিমালার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে উপকূলীয় বন ব্যবস্থাপনা জোরদার করে সুনীল অর্থনীতিতে (ব্লু-ইকোনমি) অবদান রাখা হবে। নতুন এ বন নীতিমালায় রয়েছে সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট নীতি নির্দেশনা যা ইতিপূর্বে প্রণীত কোনো নীতিমালায় ছিল না। সাধারণ নীতি নির্দেশনা হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে উপকূলীয় বন রক্ষায় সরকার সবুজ বেষ্টনী সৃজনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে, বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি করে নতুন জেগে ওঠা চর, অশ্রেণিভুক্ত

---

[১৬] বন নীতি, ১৯৯৪; ঘোষণা ১০, ১৫

[১৭] বন নীতি, ১৯৯৪; ঘোষণা ২, ৭, ১২

বন ও পতিত জমিতে বন সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে[১৮] এবং উপকূলীয় বন সম্প্রসারণ করবে[১৯]। সাধারণ নীতি নির্দেশনার মধ্যে আরও রয়েছে বন বিরুদ্ধ কাজে প্রাকৃতিক বনভূমির ব্যবহার বন্ধ করা হবে এবং সরকার প্রধানের অনুমোদন ব্যতীত সরকারি বনভূমি বন বিরুদ্ধ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সুনির্দিষ্ট নীতি নির্দেশনায় প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য (Natural World Heritage), রামসার সাইট এবং সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয়ে অঙ্গিকার রয়েছে[২০]। নীতিমালাটিতে উপকূলীয় বন ও সমুদ্র এলাকায় বনের সীমানা চিহ্নিতকরণপূর্বক বিশেষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার, উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন ম্যানগ্রোভ ও জলবায়ুসহিষ্ণু সবুজ বেষ্টনী (Green Belt) সম্প্রসারণ করার[২১] এবং ব্লু-ইকোনমিতে এরূপ বনের অবদান নিরূপণ করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে[২২]।

অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা[২৩] বিষয়ে এ নীতিমালায় নারী, বননির্ভর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন ও বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার করা; উপযোগী মডেল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা; গ্রামীণ বন বিধিমালা প্রণয়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামবন (Village Common Forest)-সহ দেশের অন্যান্য সফল অংশীদারিত্বমূলক বনায়নের রূপরেখার আইনি স্বীকৃতি প্রদান করা এবং বন, বন বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের উপর সামাজিক বনায়ন, সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার প্রভাব নিরূপণ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। নীতিমালাটিতে বনভূমিতে বনভোজন, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, উচ্চ আওয়াজ সৃষ্টিকারী যন্ত্র, দাহ্য পদার্থ, ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় কীটনাশক, বালাইনাশকসহ রাসায়নিক দ্রব্য বা বন বাস্তুতন্ত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ কোনকিছু বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার[২৪] এবং বনাঞ্চলে প্রকৃতি নির্ভর পর্যটন অনুমোদিত হলে বননির্ভর জনগোষ্ঠীকে পর্যটন পরিচালনায় সম্পৃক্ত করার বিষয়ে নীতিনির্দেশনা

---

[১৮] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ১.১

[১৯] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ১.১১

[২০] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ২.১.৬

[২১] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ২.৩.৩

[২২] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ২.১.১০

[২৩] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ২.৪

[২৪] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ২.৫.৫

রয়েছে। পর্যটন অনুমোদনের ক্ষেত্রে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর বিশেষত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি কোনো হুমকি সৃষ্টি করা যাবে না বলে নীতিনির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে[২৫]। বন নীতির বাস্তবায়ন কৌশল হিসেবে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রস্তুত এবং বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার অঙ্গিকার রয়েছে[২৬]। নীতিমালায় বন পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজ প্রাধান্য পাবে, অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে এবং গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সময়ভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে[২৭]। পরিবেশবাদীদের দীর্ঘ প্রতিক্ষার ফলাফল হিসেবে প্রণীত যুগোপযোগী এ নীতিমালায় বর্ণিত অঙ্গিকারসমূহ যদি বাস্তবে রূপ পায় তবে, ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে ক্ষয়িত বন এবং সুরক্ষিত হবে দেশে সর্বশেষ বিদ্যমান বনভূমি।

অন্যান্য নীতিমালা

বন নীতি ছাড়াও জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮; জাতীয় পানি নীতিমালা, ১৯৯৯; জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১; জাতীয় এনার্জি নীতিমালা, ২০০৪; উপকূলীয় জোন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৫; জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০; জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫; অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালা, ২০১৫; পরিবেশ নীতি, ২০১৮; জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮ এবং সমুদ্র ভ্রমন পর্যটন নীতিমালা, ২০২২ ইত্যাদি নীতিমালাসমূহে বন ও বনভূমিকে রক্ষায় জোর দেয়া হয়েছে।

জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮ এ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কেটে চিংড়ি চাষের বিস্তার বা ম্যানগ্রোভ বন বিপন্ন করতে পারে এমন চিংড়ি চাষ বিষয়ক কার্যকলাপ[২৮] এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ক্ষতি করে চিংড়ি ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে[২৯]। এ নীতিমালায় পরিবেশগত ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখতে চিংড়িঘের ও তারপার্শ্বে অবস্থিত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে উপযোগী বৃক্ষ রোপণ করতে চিংড়ি ঘেরের মালিকদের বাধ্য করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

[২৫] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ২.৫.৬

[২৬] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ২.৮.২

[২৭] জাতীয় বন নীতি, ২০২৫; ধারা ২.৮.৩

[২৮] জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮; ধারা ৭.৪

[২৯] জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮; ধারা ৯.১০.১

জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯-এ বন উজাড়কে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে[৩০]। এ নীতিমালায় বলা হয়েছে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়রোধ ও সংরক্ষণ অপরিহার্য। দেশের বেশিরভাগ পরিবেশগত সম্পদ পানি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় পানি সম্পদের অব্যাহত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধারণ, সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে এ নীতিমালায় বিবেচনা করা হয়েছে। নীতিমালাটিতে আর্দ্রভূমি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য জাতীয় বনজ সম্পদ, বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি ও পানির গুণগতমান উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ নীতিমালায় পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল সংস্থা ও বিভাগ যে সব এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে গেছে সে সব এলাকায় ব্যাপক বনায়ন ও গাছ লাগানোকে উৎসাহিত করবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১ এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণ করা অন্যতম[৩১] এবং এ নীতিমালায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমির প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে[৩২]। নীতিমালায় স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ইতোমধ্যেই যেসব জমি, বনভূমি, টিলা শ্রেণির জমি, জলাভূমি বা বিশেষ ধরনের বাগান হিসেবে পরিচিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া সেগুলোর প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন আনা যাবে না অর্থাৎ, ভরাট করে আবাসিক এলাকা সৃষ্টি বা শিল্পায়ন ইত্যাদি করা যাবে না[৩৩]। এ নীতিমালায় বলা হয়েছে জনজীবনের সুস্থতা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞগণ স্থলভূমির অন্তত ২৫% বনাচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন বলে মনে করলেও বাংলাদেশ এ মানদণ্ডে বহু নিচে। বনায়নের উপযোগী ভূমি ও চরভূমিতে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে বায়ু দূষণ প্রক্রিয়াকে বহুলাংশে প্রতিহত করা সম্ভব বলে এ নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। সংরক্ষিত ও অন্যান্য বনাঞ্চলে ব্যাপক বন সৃষ্টি এবং বর্তমান বনভূমির সঠিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এ নীতিমালায় উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে ব্যাপক বনায়ন করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে[৩৪]।

---

[৩০] জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯; ধারা ৪.১২

[৩১] জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১; ধারা ২ছ

[৩২] জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১; ধারা ৭

[৩৩] জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১; ধারা ৩.৪

[৩৪] জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১; ধারা ১০

নীতিমালাটির মুখ্য দিকগুলোর মধ্যে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত বনাঞ্চল বনভূমি হিসেবে চিহ্নিত থাকা[৩৫]; বর্তমানে ব্যবহৃত বনভূমির সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা[৩৬]; উপকূলীয় অঞ্চলে কার্যকরভাবে বনাঞ্চলের সবুজ বেষ্টনী সৃজন করা[৩৭] এবং সামাজিক বনায়নকে উৎসাহিত করা[৩৮] উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় এনার্জি নীতিমালা, ২০০৪ এ বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে এবং বন সীমানা থেকে ৩ (তিন) কিলোমিটারের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে কোন ধরনের খনিজ সম্পদ উত্তোলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে[৩৯]। তবে, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করার মাধ্যমে যদি প্রতীয়মান হয় যে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ফলে বনের কোন ক্ষতিসাধিত হবে না তবে বনের সীমানার ৩ থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে এমন উত্তোলন অনুমোদন করা যাবে।

উপকূলীয় জোন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৫ এ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস করতে উপকূলীয় অঞ্চলে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ ও বনায়নকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে[৪০]। ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য বনভূমিকে উপকূলীয় অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে এসবের টেকসই ব্যবস্থাপনায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এ নীতিমালায় যারমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলসহ নতুন জেগে ওঠা চর বনায়ন কর্মসূচির আওতায় আনা, বন সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সামাজিক বনায়ন উৎসাহিত করা ও এর পরিধি বাড়ানো উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০ এ বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে কেন্দ্র করে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নকল্পে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সুন্দরবনের আশেপাশে ও অভ্যন্তরে পরিবেশ বান্ধব সুবিধা যেমন: ইকোলজ, ওয়াচ টাওয়ার, রোপওয়ে, ওয়াকওয়ে, নাইট হাইকিংসহ অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে[৪১]। সুন্দরবনের সম্ভাব্য পর্যটন স্পটগুলো চিহ্নিত

---

[৩৫] জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১; ধারা ১৭.১১
[৩৬] জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১; ধারা ১৭.১২
[৩৭] জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১; ধারা ১৭.১৩
[৩৮] জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১; ধারা ১৭.১৪
[৩৯] জাতীয় এনার্জি নীতিমালা, ২০০৪; ধারা ৬.১
[৪০] জাতীয় এনার্জি নীতিমালা, ২০০৪; ধারা ৪.৩
[৪১] জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০; ধারা ৩.২.২

করে পর্যটন উন্নয়নের আওতায় আনতে হবে। সুন্দরবন ছাড়াও পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল দেশের অন্যান্য স্থান যেমন: সিলেটের তামাবিল, জাফলং, মাধবকুণ্ড, শ্রীমঙ্গল, সুনামগঞ্জ-সিলেটের হাওড়, লাউয়াছড়া বন; নেত্রকোণার বিরিসিরি; পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা তীরবর্তী আকর্ষণীয় স্পট; চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড; পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহসহ অন্যান্য পরিবেশগত সংকটাপন্ন স্থান (ECA) ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় পর্যটন সংস্থার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পাথর ভাঙা নীতিমালা, ২০১৩ এ স্টোন ক্রাশিং মেশিন স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনে বনভূমি পরিহার করতে বলা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী বন বিভাগের ভূমিতে স্টোন ক্রাশিং মেশিন স্থাপন বা পরিচালনা করা যাবে না[৪২]।

জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪ এর বাস্তবায়ন কৌশলের মধ্যে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কেটে চিংড়ি চাষের বিস্তার বা ম্যানগ্রোভ বন বিপন্ন করতে পারে এমন চিংড়ি চাষ বিষয়ক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ব্যবস্থা করা[৪৩], পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক জলাশয় ও সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা[৪৪], উপকূলীয় অঞ্চলে বনাঞ্চলের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তন করে এককভাবে চিংড়ি চাষের কাজে ব্যবহারের বিষয়টি নিরুৎসাহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত এ সকল জমিতে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম গ্রহণ না করা[৪৫] উল্লেখযোগ্য।

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালা, ২০১৫ এ সংরক্ষিত বন থেকে আহরিত যেকোন প্রাকৃতিক সম্পদ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রবেশ করালে অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবহারের অনুমোদন বা লাইসেন্স বাতিল করার বিধান রাখা হয়েছে[৪৬]।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ এ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে[৪৭]। এ নীতিমালায় উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে ওঠা নতুন

---

[৪২] পাথরভাঙা নীতিমালা, ২০১৩; ধারা ২(ঘ)
[৪৩] জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; ধারা ৫.৩.৫
[৪৪] জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; ধারা ৫.৭.১
[৪৫] জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; ধারা ৫.৭.৩
[৪৬] বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালা, ২০১৫; তফসিল ১
[৪৭] জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ এর ধারা ৩.৩

ভূখণ্ডসমূহে ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্য উপকূলীয় বনায়নকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে[৪৮]।

পরিবেশ নীতি, ২০১৮ এ বলা হয়েছে সংরক্ষিত বনভূমি বন ব্যবস্থাপনা ভিন্ন অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না[৪৯] এবং নগরায়নের ক্ষেত্রে বনসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে[৫০]। এ নীতিমালায় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা বিবেচনা করে বন সংরক্ষণে নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে[৫১]:

দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য, আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বন ও বৃক্ষাদি সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করতে হবে;

সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

- বনভূমি ও বনজ সম্পদের সংকোচন ও ক্ষয়রোধ করতে হবে এবং ব্যাপক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে;
- বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও এর ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করতে হবে;
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করতে হবে;
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক যেকোন প্রজাতির প্রাণী, উদ্ভিদ আমদানি নিষিদ্ধ ও অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে;
- দেশের বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণা জোরদার করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে;
- বনজ সম্পদের উপর চাপ কমাতে মূল্য সংযোজিত (value added) পণ্য, অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদন ও কাঠের বিকল্প ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে;

---

[৪৮] জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ এর ধারা ৮.৮

[৪৯] পরিবেশ নীতি, ২০১৮; ধারা ৩.১.১৩

[৫০] পরিবেশ নীতি, ২০১৮; ধারা ৩.৭.১৪

[৫১] পরিবেশ নীতি, ২০১৮; ধারা ৩.৯

- বনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বনজ সম্পদের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে;
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) এবং সংরক্ষিত এলাকাসমূহে (PA) সরকারি তদারকি ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- বিলুপ্তপ্রায় স্থানীয় প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
- বনজ সম্পদ রক্ষায় বনভূমিসমূহে কোর জোন ও বাফার জোন নির্ধারণ করে কোর জোন এলাকায় সকল ধরনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে এবং বাফার জোন এলাকায় সীমিত আকারে সম্পদ আহরণ ও ট্যুরিজম করতে হবে;
- প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনাভিত্তিক ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে;
- বনের বাইরের কোন কর্মকাণ্ড দ্বারা বন ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না;
- বনভূমির পাশে শিল্পকারখানা ও জনসমাগম হয় এমন স্থাপনা নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে;
- জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বন এলাকা সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম (ইন্টারভেনশন) হতে মুক্ত রাখতে হবে।

জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৮ এ টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কৃষি বনায়নকে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে কৃষি বনায়নকে উৎসাহিত করার এবং পরিবেশবান্ধব গাছপালা কৃষি বনায়নের নিয়ামক হিসেবে রোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে[৫২]। কৃষিনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করতে পতিত জায়গায় বনাঞ্চল সৃজন করা হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে[৫৩]।

সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা, ২০২২ এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই

---

[৫২] জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৮; ধারা ৮

[৫৩] জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৮; ধারা ৯.৩.৯

সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন গড়ে তোলা[৫৪]। এ নীতিমালায় উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশের জন্য উপকূলীয় বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে[৫৫]।

৩.২.২ পরিকল্পনাসমূহ

বিভিন্ন পরিকল্পনায় বন সংরক্ষণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে, যারমধ্যে বন মহাপরিকল্পনা, ১৯৯৬-২০১৫; জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯; প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১; অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০২০-২০২৫; জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, ২০২৩-২০৫০ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০ উল্লেখযোগ্য।

পরিকল্পনাসমূহ

- বন মহাপরিকল্পনা, ১৯৯৬-২০১৫
- জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১
- বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০২০-২০২৫
- জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, ২০২৩-২০৫০

বন মহাপরিকল্পনা, ১৯৯৬-২০১৫ এর মূল লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সাল নাগাদ দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করা। টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও জনগণের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও ইতোমধ্যে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বন বিভাগ। এ মহাপরিকল্পনা হালনাগাদ করে 'বাংলাদেশ ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান, ২০১৭-২০৩৬' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে দেশের ২০ শতাংশ ভৌগোলিক এলাকাকে বনায়নের আওতায় আনা যার সর্বনিম্ন বৃক্ষাচ্ছাদন হবে ৫০ শতাংশ; সর্বশেষ বিদ্যমান প্রাকৃতিক পাহাড়ি, শাল ও ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ; বন প্রতিষ্ঠানসমূহকে (যেমন- বন অধিদপ্তর) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সক্ষম ও শক্তিশালীকরণ। উল্লেখিত প্ল্যানে বন ও বন্যপ্রাণী আইন, বিধিমালাসমূহ হালনাগাদ ও প্রতিস্থাপন; স্বাধীন বনায়ন সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্ভাব্যতা অন্বেষণ; সরকারি বনের সীমানা চিহ্নিতকরণ; সর্বশেষ

---

[৫৪] সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা, ২০২২; ধারা ১.৪

[৫৫] সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা, ২০২২; ধারা ৪.৩

বিদ্যমান শাল ও পাহাড়ি বন রক্ষায় এলাকাভিত্তিক সুরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণসহ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে পুনঃবনায়ন; বনায়নে বেসরকারি উদ্যোগে সহযোগিতা প্রদান; অবৈধ দখল ও বন উজাড় নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ এ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং কার্বন নিঃসরণ প্রশমন করতে বনায়ন, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সম্প্রসারণ ও সামাজিক বনায়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ কৌশলপত্রে কার্বন প্রশমনে যে ছয়টি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে বনায়ন অন্যতম।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০২০-২০২৫ এ বনখাত উন্নয়নে কতিপয় উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে এবং উদ্দেশ্য পূরণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় বন রক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে টেকসই ব্যবস্থাপনার আদর্শকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের সর্বশেষ বিদ্যমান বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ করা; ক্ষয়িত বন সমৃদ্ধ করা এবং বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি করা উল্লেখযোগ্য। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের ২৪ শতাংশ ভূমিকে বনায়নের আওতায় আনা; জীববৈচিত্র্য উন্নত করার লক্ষ্যে বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ করা; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন করা এবং বননির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। এ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিকল্পনাধীন সময়ে সরকার দেশের প্রতিটি বনভূমির সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ করবে, প্রচলিত আইনি বিধানগুলো নিরীক্ষণ ও উন্নত করবে, লভ্যাংশ ভাগাভাগির মাধ্যমে বন রক্ষায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করবে, জরুরিভিত্তিতে ক্ষয়িত বনে বনায়ন ও পুনঃবনায়ন করবে, অংশগহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা জোরদার করে বন ধ্বংস হ্রাস করবে, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে উপকূলীয় বনায়ন সম্প্রসারণ করবে, রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহ-ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করবে, জ্বালানি কাঠ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উন্নত করবে, সুন্দরবন রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, বন ও বৃক্ষ তদারকি ব্যবস্থা উন্নত করবে, সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারিত করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদার করবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ইতোমধ্যে এ পরিকল্পনাসমূহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ এ বলা হয়েছে সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ ভূমি, পানি, বন ইত্যাদির বিরুদ্ধ ব্যবহার ও অবক্ষয় রোধ করে সম্পদের

যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে, বনখাতে বনায়ন ও পুনঃবনায়নে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বকে প্রাধান্য দেবে, বন অপরাধের শাস্তি বর্ধিত করবে এবং সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনায় বননির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবে এবং নতুন জেগে ওঠা চরভূমিকে বনায়নের আওতায় আনবে।

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, ২০২৩-২০৫০ (NAP) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে বন সংরক্ষণের গুরুত্ব স্বীকার করেছে। একটি টেকসই বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করার জন্য কার্যকর অভিযোজন কৌশলের মাধ্যমে একটি জলবায়ুসহনশীল জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় ৬টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যারমধ্যে প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা উল্লেখযোগ্য। এ পরিকল্পনায় সুন্দরবন রক্ষা ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। এ পরিকল্পনার অভিযোজন কৌশলের মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়ভিত্তিক বনায়ন সম্প্রসারণ করা।

বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০ এ বদ্বীপের স্থিতিস্থাপকতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে বন বিশেষ করে উপকূলীয় বন সংরক্ষণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় বিদ্যমান বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং টেকসই বনায়নকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের একটি বৃহত্তর কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসাথে বনের টেকসই ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এ পরিকল্পনায়।

৩.২.৩ আইন ও বিধিমালাসমূহ

বৃটিশ আমলে প্রণীত বন আইন, ১৯২৭ দ্বারা দেশের সকল ধরনের বন ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে। তবে আরও কিছু আইন রয়েছে যা বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত যারমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০; ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯; স্থানীয় সরকার আইনসমূহ; বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০; বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬; ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন,

আইন ও বিধিমালাসমূহ

- বন আইন, ১৯২৭
- বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬
- ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০
- ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯

২০১৩ এবং বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ উল্লেখযোগ্য। তবে, সম্প্রতি সরকার বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণে একটি যুগান্তকারী আইন প্রণয়ন করেছে যা বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬ নামে পরিচিত। নিম্নে উল্লেখিত আইনগুলোর বিধানসমূহ আলোচনা করা হলো:

বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬ বিগত ১০ এপ্রিল, ২০২৬ এ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮টি ধারাযোগে প্রণীত এ আইনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। বর্তমান সময়ের প্রত্যাশিত এ আইনে জীববৈচিত্র্য, বন, বনজ সম্পদ, বনভূমি ও বৃক্ষ সংরক্ষণসহ গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। বন হিসেবে গেজেটভুক্ত; বন হিসেবে ব্যবস্থাপনার জন্য অধিগ্রহণ, হস্তান্তর বা ন্যস্তকৃত; বন হিসেবে চিহ্নিত সকল ভূমি বা এলাকা এবং উপকূলীয় চরাঞ্চলের বনভূমি, প্রাকৃতিক বন, সৃজিত বন ও জলাভূমির বন (Swamp Forest) ইত্যাদিকে বন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে[৫৬]।

আইনটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বন, বৃক্ষ ও বনভূমির সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণে এ আইনে করণীয় নির্ধারন করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী অবক্ষয়িত বন ফিরিয়ে আনতে, বন, বনভূমি, বনের বাস্তুতন্ত্র, বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণে সরকার কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন, বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে[৫৭]। এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সকল দায়িত্ব ও

স্থানীয় সরকার আইনসমূহ

- বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (রহিত)
- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬
- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩
- বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭
- ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা আইন, ২০২৬
- সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭

---

[৫৬] বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬; ধারা ২(৬)

[৫৭] বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬; ধারা ৪

কর্তব্য পালন করবে বন অধিদপ্তর যারমধ্যে বনের সীমানা নির্ধারণ; অবক্ষয়িত বন পুনরুদ্ধার; বৃক্ষ সংরক্ষণে অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বন, ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত অধিকার সুরক্ষিত রাখা; বনভূমির দখল প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ করা; কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা ও তাদের প্রথাগত জ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব প্রদান; বন ও প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান; সকল বনায়নে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণ ও আগ্রাসি প্রজাতি পরিহার ও অপসারণ নিশ্চিত করা; বিদেশি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা এবং সময়ে সময়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির লাল তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদ করা উল্লেখযোগ্য[৫৮]। এ আইনের বিধান অনুযায়ী গেজেটভুক্ত সকল বনভূমি বন বিভাগের নামে রেকর্ডভুক্ত হবে। রক্ষিত ও অর্জিত বনভূমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভুক্ত হলেও সার্বিক ব্যবস্থাপনা বন অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং জেলা প্রশাসকগণ বন বিভাগের ব্যবস্থাপনাধীন বনের জমি বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন না[৫৯]। আইনটিতে বনভূমি ও খাস জমি সংক্রান্ত জটিলতা ও সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যৌথ জরিপ করার এবং বনের অখণ্ডতা রক্ষার্থে বনের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ভূমি বন অধিদপ্তরের অনুকূলে অধিগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে[৬০]। কোনও শিল্প এলাকার ভেতরে এক একরের কম বিচ্ছিন্ন বনভূমি থাকলে, জনস্বার্থ বিবেচনায় তা বিনিময়ের সুযোগ রাখা হয়েছে; তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দ্বিগুণ পরিমাণ নিষ্কণ্টক জমি বন অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করতে হবে যা পরবর্তীতে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষিত হবে[৬১]। প্রাকৃতিক বন বনবিরুদ্ধ কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গাছ কাটার ক্ষেত্রে অনুমতির বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এ আইনে। সরকারি বন, সামাজিক বন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গণপরিসরের গাছ কাটতে হলে বাধ্যতামূলকভাবে বন সংরক্ষণ কর্মকর্তার অনুমতি নিতে হবে। এমনকি ব্যক্তিমালিকানাধীন গাছ যদি সরকারি 'কর্তনযোগ্য' তালিকায় থাকে তা কাটার জন্য আগাম অনুমতির প্রয়োজন হবে। তবে রোগাক্রান্ত বা মৃত, ঝড়ে পড়া, সড়ক যোগাযোগে বাধাসৃষ্টিকারী, প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ গাছ কাটতে আগাম অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

---

[৫৮] বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬; ধারা ৫
[৫৯] বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬; ধারা ৬
[৬০] বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬; ধারা ৬
[৬১] বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬; ধারা ৮

এ আইনের অধীন গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধমে প্রকাশিত কর্তন নিষিদ্ধ প্রজাতির গাছ বা বন অধিদপ্তর কর্তৃক ঘোষিত বিপদাপন্ন কোনো গাছ কাটলে অপরাধীকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদান করতে হবে[৬২]। এক্ষেত্রে আদালত অতিরিক্ত দণ্ড হিসেবে ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন। কেবল গাছ কাটাই নয়, গাছের ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে ধাতব বস্তু বা পেরেক প্রবেশ করালে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে আইনটিতে[৬৩]।

পরিবেশবাদীদের দীর্ঘ আন্দোলন ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে এ আইনের মাধ্যমে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সংরক্ষণধর্মী ও জনমুখী আইন প্রণীত হলো বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণে। এ আইনের সফল প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন দেশের পরিবেশগত নিরাপত্তা জোরদার করবে। বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গাছ কাটা এবং বনভূমি গ্রাসের প্রবণতা বন্ধ করতে এ আইনি কাঠামোটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে, যার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বনভূমি রক্ষায় সরকারের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি।

বন আইন, ১৯২৭ এর উদ্দেশ্য রাজস্ব আদায়, বনজ সম্পদের পরিবহণ ও সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করা। আইনের ধারা ২ এ বৃক্ষ, কাঠ, বনজ পণ্য, নদী ইত্যাদির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ৮৫টি ধারা সম্বলিত এ আইনের ধারা ৩ এ সরকারকে সংরক্ষিত বন ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আইনটিতে সংরক্ষিত বন ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৩ ধারায়, চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত বন ঘোষিত হয় ২০ ধারায় এবং ২১ ধারায় সংরক্ষিত বন চূড়ান্তকরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট গ্রাম ও শহরে প্রচার করার বিধান রয়েছে। প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে জনগণের প্রথাগত অধিকার নিষ্পত্তি বিষয়ক ধারাসমূহ অনুযায়ী কোন বন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত ঘোষণার পূর্বে জনগণের ভূমি ও চাষাবাদের অধিকার (ধারা ৫ ও ১১), জুম চাষের অধিকার (ধারা ১০), গোচারণের অধিকার (ধারা ১২), বনজ দ্রব্যের অধিকার (ধারা ১২), চলাচলের অধিকার (ধারা ১১) এবং পানি প্রাপ্তির অধিকার (ধারা ১১) সংক্রান্ত সকল দাবি নিষ্পত্তি করতে হবে। কোন সংরক্ষিত বনের ভেতর রাস্তা বা পানি প্রবাহ বন্ধ করার পূর্বে বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ধারা

[৬২] বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬; ধারা ১০(১)
[৬৩] বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬; ধারা ১০(৩)

২৫ এ। বিভিন্ন দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা যে বিষয়টি প্রধানত বিবেচনায় নেবে তা হলো সংরক্ষিত বনের ব্যবস্থাপনা (ধারা ১৬)। ফরেস্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার সকল আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল করার বিধান রাখা হয়েছে ধারা ১৭ এ। ধারা ২৬ এর বিধান অনুযায়ী বনে অগ্নিসংযোগ করা; অনধিকার প্রবেশ করে গবাদি পশু চড়ানো; বন হতে কাঠ অপসারণ করা; বৃক্ষের বাকল তোলা বা বাকল চেঁছে রস সংগ্রহ করা বা আইন বহির্ভূতভাবে কাঠ সংগ্রহ করা; বৃক্ষ কিংবা কাঠ কাটার সময় অবহেলাবশত বনের ক্ষতিসাধন করা; পাথর উত্তোলন, কাঠ কয়লা পোড়ানো বা কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য কাঠ ব্যতীত অন্য কোন বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করা বা সরানো; চাষাবাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বন উজাড় করা; অনুমোদন ছাড়া শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা, ফাঁদ পাতা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। সংরক্ষিত বন অবমুক্ত করার বিষয়ে সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ধারা ২৭ এ। এ ধারার বিধান অনুযায়ী সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট কোন বন আর সংরক্ষিত রইল না মর্মে ঘোষণা দিতে পারে।

সরকার এ আইনের অধীন কোন বনভূমিকে, পরিত্যক্ত (waste land) ভূমিকে বা চরভূমিকে বন আইনের ২৯ ধারা অনুযায়ী গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। এরূপ ভূমিতে ব্যক্তিগত অধিকারের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি লিপিবদ্ধ না করে কোন প্রজ্ঞাপন জারি করা যাবে না। তবে সরকার যদি মনে করে যে অধিকার লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গেলে তা সরকারের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তবে সে প্রক্রিয়া শেষ না করেই সরকার রক্ষিত বন ঘোষণা করতে পারে। রক্ষিত বনে সরকার কোন বিশেষ বৃক্ষরাজীকে সংরক্ষিত ঘোষণা করতে পারে এবং বনের কোন অংশ সর্বোচ্চ ৩০ বছরের জন্য সর্বসাধারণের প্রবেশের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। তবে এরূপ ঘোষণার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে বাকি অংশ প্রথাগত অধিকার চর্চার জন্য পর্যাপ্ত এবং তার অবস্থানও সুবিধাজনক।

বন আইনের ধারা ৩২ অনুযায়ী রক্ষিত বনে সরকার বিধি দ্বারা গাছ বা কাঠ কাটা, সংগ্রহ; বনজ দ্রব্য সরানো; বন সংলগ্ন শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের গাছ, কাঠ বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য সংগ্রহের স্বার্থে লাইসেন্স প্রদান; বাণিজ্যিক স্বার্থে গাছ কাটা বা সরানো বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য সংগ্রহের লাইসেন্স প্রদান এবং এ সকল লাইসেন্স প্রাপ্তদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ আদায়; বনজ দ্রব্য সরানোর ক্ষেত্রে

প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ; ঘাস কাটা বা গোচারণ নিয়ন্ত্রণ; চাষাবাদের স্বার্থে বনভূমির ব্যবহার; বন ও কাঠকে আগুন থেকে রক্ষা; শিকার, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা এবং ফাঁদ পাতা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

বন আইনের ৪১ ধারা বনজ দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ সরকারের উপর ন্যস্ত করে। এ ধারা অনুযায়ী কাঠ বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য সড়ক বা নৌ-পথে পরিবহণকালে তার নিয়ন্ত্রণ সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ সকল বিধি দ্বারা সরকার বনজ দ্রব্য পরিবহণে পথ নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র গ্রহণে নির্দেশ প্রদান, পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ডিপো স্থাপন, নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে কাঠভিত্তিক শিল্প স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা, কাঠের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিহ্ন ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

১৯২৭ সালের বন আইন প্রণয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বনভূমির বৃক্ষ, মাটির নিচের সম্পদ এবং অন্যান্য সকল সম্পদ সাধারণের ব্যবহারের পরিবর্তে সরকারের কর্তৃত্বে আনাই বৃটিশ সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল। বন সংরক্ষণ নয় বরং বন সংক্রান্ত সে সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন বিধান একত্রিত করা, বনজ দ্রব্যের পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং বনজ দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা এ আইনের উদ্দেশ্য। ফলশ্রুতিতে, এ আইনে 'বন' বা 'বন সংরক্ষণ' এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। পরিবেশ ও বন সংরক্ষণের ধ্যান ধারণায় আমূল পরিবর্তন আসলেও এ আইন ১৯৯০ এবং ২০০০ সালে মাত্র দু'বার পরিবর্তিত হয়েছে যা প্রগতিশীল কোন মূল্যবোধকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি বরং সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ডকে আইনগত বৈধতা প্রদানই ছিল এ সংশোধনীর মূল প্রতিপাদ্য।

বিভিন্ন বনকে সংরক্ষিত ও রক্ষিত ঘোষণার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা বেশ দীর্ঘ, তবে সকল ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট নয়। ৪ ধারায় গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশের কতদিনের মধ্যে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা দাবি সংক্রান্ত আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেবে তা আইনে উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে ৬ ধারায় নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার ১২ মাসের মধ্যে সকল দাবির নিষ্পত্তি করতে হবে। জেলা প্রশাসক চাইলে এ ১২ মাসের অতিরিক্ত হিসেবে প্রথমে ২ মাস এবং পরে আরও ৪ মাস সময় দিতে পারেন। তবে এ অতিরিক্ত সময় অতিক্রান্ত হলে তার আইনগত পরিণাম বিষয়ে কোন বিধান নেই। বিভিন্ন বন ৪ ধারার অধীনে গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হবার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও ২০ ধারায় চূড়ান্তভাবে তা সংরক্ষিত ঘোষিত হয়নি। এরূপ বিলম্বের ফলে কেবল যে বনের আইনগত অবস্থান অনির্ধারিত

রয়ে গেছে তা নয়, বরং প্রথাগত অধিকারের দাবিগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ায় বন প্রশাসনের সাথে বনবাসীদের বিরোধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে।

বিভিন্ন দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যদি ফরেস্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সংরক্ষিত বনের ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কোন স্বীকৃত অধিকারের চর্চা অব্যাহত রাখার অনুমতি দেয়া অসম্ভব তবে সে অধিকারের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, ভূমি বা অন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। যদিও বন ব্যবস্থাপনার সাথে প্রথাগত অধিকার চর্চার আপাতত কোন বিরোধ নেই, তবুও এ বিধান বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের মানসিকতারই প্রতিফলন। আইনের এ বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত বনের ব্যবস্থাপনার সাথে কোন ধরণের আপোষ করার কোন সুযোগ নেই। সে অর্থে কোন সংরক্ষিত বনের ব্যবস্থাপনায় ভিন্ন প্রজাতির বাণিজ্যিক বৃক্ষরোপণের স্বার্থে সামাজিক বনায়নের অন্তর্ভুক্তিকরণ এ বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৬ ধারার অধীনে কোন অধিকার চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট কর্মকর্তাকে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসরণ করতে হবে বলা হলেও এ আইনের অধীনে প্রণীত বিধিসমূহে এ সংক্রান্ত কোন বিধান নেই। এ আইনে সংরক্ষিত এবং রক্ষিত বন সংক্রান্ত বিধানগুলোতে বন রক্ষায় সরকারের করণীয় নির্ধারণ না করে সেইসব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে যার অধিকাংশই বননির্ভর জনগোষ্ঠীর অধিকার।

১৯২৭ সালের বন আইন ঔপনিবেশিক আইন হলেও এ আইনের একটি বিশেষ বিধান ধারা ২৮ যা বন ব্যবস্থাপনার কথা বলে। এ বিধানটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ, প্রগতিশীল এবং টেকসই। এ ধারা অনুযায়ী সরকার যেকোন সংরক্ষিত বনে তার অধিকার যেকোন গ্রাম সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ ও তা বাতিল করতে পারে। এ জাতীয় সকল বন ভিলেজ ফরেস্ট বা গ্রামবন নামে পরিচিত হবে। গ্রাম বনের ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে সরকার বন রক্ষায় জনগণের অংশগ্রহণের কথা বললেও এযাবৎ ধারা ২৮ এর অধীনে কোন বিধি প্রণয়ন করেনি। সরকারের প্রণীত বিধিগুলোতে কেবল নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার প্রবণতা দেখা যায়। সুস্পষ্ট নীতিগত প্রতিশ্রুতি থাকলেও প্রথাগত অধিকার রক্ষায়, স্বীকৃতি প্রদানে বা বন ব্যবস্থাপনায় জনগণকে আইনগতভাবে সম্পৃক্ত করতে সরকার কোন বিধি প্রণয়ন করেনি। গ্রাম বন বিধিমালা প্রণয়ন না করলেও জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে সরকার ২০০০ সালে আইন সংশোধন করে ২৮ক ধারা সংযোজন করে সামাজিক বনায়ন বিষয়ক বিধি

অন্তর্ভুক্ত করেছে। গ্রামবন সরকারের ক্ষমতা গ্রামীণ সম্প্রদায়কে অর্পণ করার কথা বলে। অন্যদিকে সামাজিক বনায়ন বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, বন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অধীনে, সরকার কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত লভ্যাংশের বিনিময়ে এবং বন বিভাগ কর্তৃক মনোনীত কিছু সংখ্যক উপকারভোগীর গাছ লাগানো কর্মসূচিকে বুঝায়। গ্রামবন ব্যবস্থাপনার সাথে সামাজিক বনায়নের মৌলিক পার্থক্য হলো গ্রামবন ব্যবস্থাপনায় বন সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ; অন্যদিকে সামাজিক বনায়ন কাঠ বা বনজ দ্রব্যভিত্তিক। সামাজিক বনায়ন মতবাদ বন সংরক্ষণে তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখে না, কেননা রোপিত বৃক্ষ বনের প্রাকৃতিক প্রজাতির নয় বরং দ্রুত বর্ধনশীল ভিন্ন ও বাণিজ্যিক প্রজাতির যা মেয়াদান্তে কেটে ফেলা হয়।

সামাজিক বনায়ন নামক নিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি নানাকারণে সমালোচিত। যে সকল প্রাকৃতিক বনে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার অধিকাংশেই রয়েছে ভূমির মালিকানা নিয়ে বনবাসীদের সাথে বিরোধ। ফলে প্রথাগত বনবাসীরা এ কর্মসূচিতে তেমন অংশগ্রহণ করছে না। বরং তাদের দাবিকৃত ভূমিতে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনেকাংশেই বাধার মুখোমুখি হচ্ছে বনবিভাগ। বন ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থতা, বনের পরিবেশ বিরুদ্ধ প্রজাতি নির্বাচন, প্রথাগত বনবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারা ইত্যাদি ছাড়াও লভ্যাংশ ভাগাভাগির ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষয়টিও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির বিরুদ্ধে অন্যতম সমালোচনার ক্ষেত্র। বন আইনের ৪১ ধারার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে বন বিভাগ সব সময়ই বনজ দ্রব্যের উপর সরকারি মালিকানা দাবি করে এবং উপকারভোগীকে তা বিক্রি করবার অধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ ধারা মূলত বনজ দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ সরকারের উপর ন্যস্ত করে মাত্র।

বন আইন, ১৯২৭ অনুযায়ী সংরক্ষিত (রিজার্ভ) বা রক্ষিত (প্রটেক্টেড) বনে অধিকার চর্চা করে অথবা এরূপ বনের বনজ সামগ্রী সংগ্রহে অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা শ্রমের বিনিময়ে ভাতাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি বন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে বন বিভাগ ও পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে বাধ্য[৬৪]। ২০০০ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ৬৩ক সংযোজন করে বন অপরাধকে জামিনঅযোগ্য করা হয়। এ আইনের অধীনে কৃত অপরাধের বিচারে সরকার পৃথক প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

[৬৪] বন আইন, ১৯২৭; ধারা ৭৯

আদালত গঠন করতে পারে। ১৯২৭ সালের আইনে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই বন অপরাধে জড়িত সন্দেহে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সকল বন অপরাধের শাস্তির মাত্রাই ১ মাস কারাদণ্ডের অধিক[৬৫]। সরকার বন আইনের অধীনে রেঞ্জারের নিম্ন পর্যায়ের নয় এমন বন কর্মকর্তাকে বন অপরাধের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। গ্রেফতার এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের নামে হয়রানিমূলক আইনি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কোন বিধান আইনে নেই।

বন আইনের অধীনে কোন বন কর্মকর্তা সরকারের অনুমতি ব্যতীত বনজ দ্রব্য সংক্রান্ত কোন ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না[৬৬]। তবে এ ধারার ব্যত্যয় ঘটলে তার কোন শাস্তি আইনে উল্লেখ নেই। কোন বন কর্মকর্তা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে অথবা অপ্রয়োজনীয়ভাবে কোন বনজ দ্রব্য আটক করলে তার শাস্তি হতে পারে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা। এরূপ অপরাধের সর্বনিম্ন শাস্তি ১ মাস কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ২,০০০ টাকা জরিমানা[৬৭]। বন আইনের অন্য কোন অপরাধে সর্বনিম্ন শাস্তির বিধান নেই।

ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর বিধান অনুযায়ী সরকারি ও ব্যক্তিগত সকল বনভূমির মালিক একমাত্র সরকার। এ আইনের বিধান[৬৮] অনুযায়ী বন হিসেবে রেকর্ডকৃত সকল ভূমির মালিকানা সরকারের উপর ন্যস্ত।

ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন বন সংরক্ষণ এবং কতিপয় পতিত ভূমিতে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। এ আইনে মূলত ব্যক্তিমালিকানাধীন বন, অর্পিত বন এবং নিয়ন্ত্রিত বন সম্পর্কে বলা হয়েছে। ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯ এর ৩ থেকে ৬৩ ধারার বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিমালিকানাধীন বনভূমি সংরক্ষণ বা বনায়নের উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমির প্রকৃত মালিক এ

---

[৬৫] বন আইন, ১৯২৭; ধারা ৬৪

[৬৬] বন আইন, ১৯২৭; ধারা ৭৫

[৬৭] বন আইন, ১৯২৭; ধারা ৬২

[৬৮] ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০; ধারা ২০(২ক)(ই)

বন ব্যবস্থাপনা করবে। ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯ অনুযায়ী বনের মালিক যদি কর্মপরিকল্পনার শর্ত ভঙ্গ করে এবং বনটি সংরক্ষণে ব্যর্থ হয় তবে আবার নিয়ন্ত্রিত বনটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোন আঞ্চলিক বন কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করা যায়। এক্ষেত্রে বনের নিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে বনটির নিয়ন্ত্রণ মূল মালিকের কাছে চলে যাবে[৬৯]। এছাড়া কোন আঞ্চলিক বন কর্মকর্তা যদি রিপোর্ট করে যে কোন পতিত জমি তিন বছর যাবৎ অনাবাদি অবস্থায় আছে এবং তা বনায়নের উপযোগী তবে সরকার সেই বনভূমির নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক বন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করতে পারে ও ন্যস্ত বন হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে।

উল্লেখ্য, বন আইন, ১৯২৭ এর ৩৮ক(১)(২) ধারা অনুযায়ী সরকার আর কোন ব্যক্তিগত বন ন্যস্ত ঘোষণা করতে পারবে না। একইসাথে বনায়নের উপযোগী পতিত জমিও আঞ্চলিক বন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে না। যেসকল বিষয়ে সরকার আর কর্তৃত্ব অর্পণ করতে পারবে না সেগুলো হলো: ১) ব্যক্তিগত বন রক্ষায় কর্মপরিকল্পনা তৈরি[৭০], ২) কর্মপরিকল্পনার বিধান লঙ্ঘন সংক্রান্ত শাস্তি[৭১], ৩) ব্যক্তিগত বন রক্ষায় তা কোন বন আঞ্চলিক কর্মকর্তার নিকট ন্যস্তকরণ[৭২] এবং ৪) তিন বছর যাবৎ পতিত অবস্থায় থাকা বনায়নের উপযোগী অনাবাদি জমি কোন আঞ্চলিক বন কর্মকর্তার নিকট ন্যস্তকরণ[৭৩]।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯ এ ব্যক্তিগত বনের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশে কোন ব্যক্তিগত বন নেই। কেননা রাষ্ট্রীয় ভূমি ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী বন হিসেবে রেকর্ডকৃত সকল ভূমির মালিকানা সরকারের উপর ন্যস্ত।

বিভিন্ন স্থানীয় সরকার আইনের মধ্যে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (সংশোধিত ২০২৪); স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (সংশোধিত ২০২৪); জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০২৪) এবং উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০২৪) আইনসমূহে বনভূমি

---

[৬৯] ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৫৯; ধারা ১১

[৭০] বন আইন, ১৯২৭; ধারা ৩

[৭১] বন আইন, ১৯২৭; ধারা ৬(২)

[৭২] বন আইন, ১৯২৭; ধারা ৭

[৭৩] বন আইন, ১৯২৭; ধারা ১১

সংরক্ষণের বিষয়ে বিধান রাখা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (সংশোধিত ২০২৪) এ বলা হয়েছে সিটি কর্পোরেশন বন উন্নয়ন, বন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বনাঞ্চলে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করতে পারবে[৭৪]। গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ করা জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কার্যাবলী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে[৭৫]। বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা উপজেলা পরিষদ আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম[৭৬]। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইনে বলা হয়েছে পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বন ও উদ্ভিদের উন্নয়ন সাধন এবং তা কাজে লাগানোর জন্য বন পরিকল্পনা মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে পারবে[৭৭]।

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ বিগত ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ ২০১২ সালে একই নামে প্রণীত আইন রহিত করে নতুন এ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন প্রণয়ন করেছে সরকার। এর নয়টি অধ্যায়ে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য, বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষা, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, রক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা, পারমিট লাইসেন্স ও পজিশন সার্টিফিকেট, আমদানি-রপ্তানি, বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র, বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন, অপরাধ জরিমানা ও দণ্ড ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আইন অনুযায়ী বন্যপ্রাণী রক্ষায় সাধারণ করণীয় হিসেবে বন অধিদপ্তরের অধীন বন্যপ্রাণী উইং নামে একটি উইং প্রতিষ্ঠা এবং বন্যপ্রাণী কল্যাণ ও সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা কেন্দ্র ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে[৭৮]। এ আইনের বিধান অনুযায়ী বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা, কল্যাণ, সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বন অধিদপ্তর নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে দেশের বন্যপ্রাণীর এবং অবস্থান অনুযায়ী মহাবিপন্ন, বিপন্ন, সংকটাপন্ন ও প্রায় বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীর তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করবে; উল্লেখিত তালিকায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা বিভিন্ন প্রকার বন্যপ্রাণীর ঝুঁকিহ্রাস, কল্যাণ, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও করিডোর চিহ্নিত ও সুরক্ষিত রাখবে; বন্যপ্রাণীর কল্যাণসহ সুরক্ষা ও

[৭৪] স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯; তৃতীয় তফসিল, ক্রমিক নং ২৪.৬
[৭৫] জেলা পরিষদ আইন, ২০০০; প্রথম তফসিল, দ্বিতীয় অংশ, ক্রমিক নং ৪০
[৭৬] উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮; দ্বিতীয় তফসিল, ক্রমিক নং ১১
[৭৭] স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯; দ্বিতীয় তফসিল, ক্রমিক নং ৫৩
[৭৮] বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬; ধারা ৪

সংরক্ষণ বিষয়ে, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব নিরসনে ও সহাবস্থান নিশ্চিত করতে, বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণরোধে এবং বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা, ক্ষতিপূরণ প্রদান, আইনি প্রক্রিয়া, উদ্দীপণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা গ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং উদ্ধারকৃত ও আহত বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় নির্দেশিকা প্রণয়নসহ বন্যপ্রাণী শুশ্রূষা ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে[৭৯]।

আইন অনুযায়ী বন্যপ্রাণী, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও কল্যাণ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা এবং দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করতে হবে[৮০]। অভিজ্ঞ বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বিশারদগণের সমন্বয়ে একটি বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠন করতে হবে[৮১]। বন্যপ্রাণীর কল্যাণ, সংরক্ষণ, উদ্ধার ও উদ্ধার পরবর্তী শুশ্রূষা নিশ্চিতকরণ, পুনর্বাসন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রজনন, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, জনসচেতনতা ইত্যাদি কাজের জন্য বন্যপ্রাণী ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের বিধান রাখা হয়েছে এ আইনে[৮২]। সন্দেহজনক বন অপরাধীদের পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তারের ক্ষমতাও পেয়েছে বন কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

হুমকির মুখে থাকা দেশের বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় নতুন আইনে বেশকিছু পরিবর্তন এসেছে। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল টিকিয়ে রাখতে অনুকূল এমন ১০০ প্রজাতির গাছকে রক্ষিত উদ্ভিদ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এগুলো কর্তন ও ধ্বংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইসাথে হাট-বাজার বা অন্য কোনো মাধ্যমে বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ যাবে না। কোনও ব্যক্তি বন্যপ্রাণীর প্রতি কোনো নিষ্ঠুর আচরণ করলে আইন অনুযায়ী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

রহিতকৃত ২০১২ সালের আইনে বন সংরক্ষণে সরকার ও বন বিভাগের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা ছিল না। নতুন আইনে সেগুলো স্পষ্ট করা হয়েছে। বন আইনে

---

[৭৯] বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬; ধারা ৫

[৮০] বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬; ধারা ৬

[৮১] বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬; ধারা ৭

[৮২] বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬; ধারা ৯

প্রথাগত বনবাসীর অধিকারকে সংরক্ষণ ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ আইনের অধীনে বন অধিদপ্তর বনের সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ করবে, যাতে বনভূমি নতুন করে বেদখল না হয়।

রহিত বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২ এর মতো নতুন প্রণীত আইনে চারটি তফসিল থাকলেও তসফিল ১ কে ক, খ এবং গ এ তিন উপতফসিলে বিভক্ত করা হয়েছে। তফসিল ১(ক) এ বাঘ ও হাতিকে ঐতিহ্য বা জনপ্রিয় এবং পরিবেশের সূচক হিসেবে বিবেচনা করে এগুলোর শিকার, ধরা, মারা, উত্ত্যক্ত, পরিবহণ, ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি, রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০১২ সালের আইনের নবম অধ্যায়ের ৩৬ ধারায় বাঘ ও হাতি শিকারকে আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে জামিনঅযোগ্য করা হয়েছিল। কেউ লাইসেন্স গ্রহণ ছাড়া প্রথমবার বাঘ ও হাতি হত্যা করলে সর্বনিম্ন ২ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ১ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার এবং একই অপরাধ দ্বিতীয়বার করলে অপরাধীর সর্বোচ্চ ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ১৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়ার আগের বিধান বহাল রাখা হয়েছে নতুন আইনে। তবে, আগের আইনে বাঘ ও হাতি হত্যাকে আমলযোগ্য ও জামিনঅযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করলেও ৪৩ ধারায় অন্যান্য প্রাণী শিকারের অপরাধ আমলঅযোগ্য ও জামিনযোগ্য ছিল। নতুন আইনের ৪৬ ধারায় তফসিল ১ এর ক ও খ তে থাকা বন্যপ্রাণী শিকারকে আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এটাকে জামিনঅযোগ্য করা হয়েছে। ফলে ক তফসিলে থাকা বাঘ, হাতির সঙ্গে এখন ২৫০টি প্রাণী শিকার যোগ হচ্ছে জামিনঅযোগ্য অপরাধ হিসেবে।

আইনে ১৩২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৭৩২ প্রজাতির পাখি, ১৬০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬০ প্রজাতির উভচর, ৯১ প্রজাতির হাঙর ও শাপলা পাতা, ৬ প্রজাতির কাঁকড়া, ২৩ প্রজাতির সামুদ্রিক শসা, ৩টি গুরুত্বপূর্ণ মাছ, ৩২ প্রজাতির কোরাল, ১৩৮ প্রজাতির শামুক ও ঝিনুক, ১৮৮ প্রজাতির প্রজাপতি ও মথ, ২৪ প্রজাতির বিটলস ও ১০০ প্রজাতির উদ্ভিদকে সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী মিলিয়ে মোট ১৬৮৯ প্রজাতি এ আইনে সুরক্ষার আওতায় এসেছে।

যেহেতু এ আইনের বাস্তবায়নে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা রয়েছে তাই বন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ আইন সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করতে হবে, যাতে তারা আইনটির সঠিক প্রয়োগ

নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে একটা দৃশ্যমান অগ্রগতি হবে বলে পরিবেশবাদীগণ আশাবাদ ব্যক্ত করছেন।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন, ১৯৯২ এর উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এর অধিকাংশ সংজ্ঞা গ্রহণ করেছে। এ আইনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শপূর্বক জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণার বিধান রয়েছে। আইনের ৩১ ধারায় জীবসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রণীত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় জীববৈচিত্র্য সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ও পর্যবেক্ষণ, ইন-সিটু (In-Situ) ও এক্স-সিটু (Ex-Situ) সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও নিয়মাবলী এবং জীববৈচিত্র্য বিষয়ে গবেষণামূলক ও শিক্ষা-সচেতনতামূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ আইনটিতে বিপন্ন প্রাণী বা জীবসম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে। সাত স্তরের কমিটির গঠন এ আইনে প্রস্তাব করা হয়েছে যা পরবর্তীতে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিকে জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত একটি জাতীয় নিবন্ধক প্রস্তুত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী বনভূমি থেকে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ। এ আইনে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন সরকারি মালিকানাধীন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ থেকে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদি তা সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে হয়[৮৩]।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ছাড়পত্র থাকুক বা না থাকুক, এ আইন কার্যকর হবার পর সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান বা জলাভূমি এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে এবং সরকারি

---

[৮৩] বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০; ধারা ৪

বনাঞ্চলের সীমারেখা থেকে ২ (দুই) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইটভাটা স্থাপন করতে পারবে না[৮৪]।

ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এ বন এবং বনভূমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য বনের মধ্যে উপকূলীয় প্রাকৃতিক ও সৃজিত বন এ সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক বনের ক্ষতিসাধন ও বন বিরুদ্ধ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে[৮৫]। এ আইনে বন ও বনভূমির তালিকা প্রস্তুত, সীমানা নির্ধারণ ও সুরক্ষা করা জেলা প্রশাসকগণের দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে[৮৬]।

সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬ ২০০৪ সালের বিধিমালা রহিত করে এ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিধিমালায় বন অধিদপ্তরের অনুসরণীয় কতিপয় সাধারণ নীতি উল্লেখ করা হয়েছে যারমধ্যে প্রাকৃতিক বনে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে কেবল অবক্ষয়িত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন বাস্তবায়ন করা, বনের বৈশিষ্ট্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা, রোপিত বৃক্ষ সংরক্ষণ করা, রোপিত বাগান যথাসম্ভব প্রযুক্তির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা, স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা, স্থানীয় অংশীজনের সাথে আলোচনা করে স্থানীয় প্রজাতির ও পরিবেশ উপযোগী বৃক্ষরোপণ করা, আগ্রাসি বা বিদেশি প্রজাতি পরিহার করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য[৮৭]। এ বিধিমালায় সামাজিক বনায়নের জন্য সামাজিক বনায়ন জোন তৈরির বিষয়ে বলা হয়েছে এবং এ জোন তৈরির ক্ষেত্রে অবক্ষয়িত এবং বন বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত বনভূমি চিহ্নিত করার বাধ্যবাধতা রয়েছে। প্রাকৃতিক বনে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে এ বিধিমালার বিধান অনুযায়ী স্থানীয় অংশীজনকে গাছ কেটে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাবে না। এক্ষেত্রে পৃথক ব্যবস্থাপনায় শ্রমের মূল্য ও রোপিত বাগান কেন্দ্রিক সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। তবে, রক্ষিত এলাকা ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকায় বাস্তবায়িত সামাজিক বনায়নের আবর্তকাল শেষ হয়েছে এমন সরকারি বনাঞ্চলে সামাজিক বনায়ন জোন চিহ্নিতকরণ নিষিদ্ধ

---

[৮৪] ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩; ধারা ৮(১) এবং ৮(৩)(খ)

[৮৫] ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা আইন, ২০২৬; ধারা ৭

[৮৬] ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা আইন, ২০২৬; ধারা ৯

[৮৭] সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬; বিধি ৩

করা হয়েছে এ বিধিমালার মাধ্যমে[৮৮]। সামাজিক বনায়নের অংশীজন নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি থাকবে এবং কমিটি নির্ধারিত ভূমির এক কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী ভূমিহীন বা ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক, দুঃস্থ নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর দুঃস্থ সদস্য, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর অধিবাসীদের মধ্য থেকে অংশীজন নির্বাচন করবে[৮৯]। এ বিধিমালায় সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কমিটির দায়িত্বের মধ্যে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় সৃজিত বনের সুষ্ঠু পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে তদারকি ও পরামর্শ প্রদান, সামাজিক বনায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুবিধা বণ্টনে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং স্থানীয় অংশীজনকে বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন অন্যতম প্রধান দায়িত্বসমূহ[৯০]। এছাড়া বন অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এ বিধিমালায়। ইতিপূর্বে বিধিতে সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে যা বলা ছিল বাস্তবে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই তার প্রতিফলন হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের আর্থিক প্রাপ্তি বড় করে দেখানো হলেও বন রক্ষায় বা পুনরুদ্ধারে এ সকল প্রকল্প তেমন কার্যকরী নয়। বরং প্রাকৃতিক বন পরিষ্কার করে সামাজিক বনায়নের নামে ভিন্ন ও বিদেশি প্রজাতির একাশিয়া, মেহগনি গাছ রোপণ করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে কলা, আনারস, সীম, পেঁপে ইত্যাদি যা প্রাকৃতিক বন রক্ষার পরিবর্তে ধ্বংস করেছে। আবার নির্দিষ্ট আবর্তকালের পর বৃক্ষাচ্ছদন কেটে ফেলাতে বন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। উপকারভোগীদের অধিকার সীমিত হওয়ায় কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের মতামত উপেক্ষিতই থেকে গেছে। যুগোপযোগী এ বিধিমালার সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীতে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং অবক্ষয়িত বন পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এ প্রাকৃতিক বন এবং প্যারাবন রক্ষায় বিধান রাখা হয়েছে। এ বিধিমালা অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের স্থান

---

[৮৮] সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬; বিধি ৪(৫)

[৮৯] সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬; বিধি ৫(১) এবং ৫(৩)

[৯০] সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০২৬; বিধি ১০

নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিপন্ন/হুমকিগ্রস্ত/স্থানীয় প্রজাতিসমূহের আবাসস্থল, প্রাকৃতিক বন এবং প্যারাবন ইত্যাদি পরিহার করতে হবে[৯১]।

রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়নের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। এ বিধিমালায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি সাধারণ ও একটি নির্বাহী কমিটির গঠন ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যা অনুমোদন করবে সাধারণ কমিটি। এছাড়া জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে নির্বাহী কমিটি এবং পরামর্শ প্রদান করবে সাধারণ কমিটি। নির্বাহী কমিটির অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে স্থানীয় অংশীজনদের উদ্বুদ্ধকরণ; রক্ষিত এলাকায় টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ; কমিউনিটি টহল দলের সহায়তায় রক্ষিত এলাকায় টহলের ব্যবস্থা গ্রহণ; কমিউনিটি টহল দলের উন্নয়ন ও সম্মানী প্রদানসহ বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমের অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; রক্ষিত এলাকা ও এর সংলগ্ন এলাকায় টেকসই উন্নয়নের নিমিত্ত এ বিধিমালায় বর্ণিত উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ; বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বা স্থাপিত অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; বাফার জোন ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে বন সৃজন ও সৃজিত বনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম তদারকি; রক্ষিত এলাকা ও এর সংলগ্ন এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন; রক্ষিত এলাকা ও সংলগ্ন এলাকার মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বন অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান; জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে রেখে সঙ্গতি রেখে অভিযোজনের বিষয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রচারণামূলক কর্মসূচি পরিচালনা; বন রক্ষার কাজে নিয়োজিত বা বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ পেতে আবেদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সহায়তা প্রদান; রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ; পিপলস্ ফোরাম, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এবং কমিউনিটি টহল দলের সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান; অবৈধ দখল রোধে এবং অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারে বন অধিদপ্তরকে সহযোগিতা প্রদান; করিডোর চিহ্নিতকরণ এবং বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বন অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান; সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব-নিরীক্ষা নিশ্চিতকরণ; রক্ষিত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এ বিধিমালায় বননির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে পিপলস্ ফোরাম, গ্রাম

[৯১] পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩; তফসিল ৯

সংরক্ষণ ফোরাম ও কমিউনিটি টহল দল ইত্যাদির গঠন ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ বিধিমালায় সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধারের বিষয়টি তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি।

উপরিল্লিখিত আইনী আলোচনা থেকে বন সুরক্ষায় ও ব্যবস্থাপনায় প্রণীত মূল আইনসমূহের সবল ও দুর্বল দিক তুলে ধরা হলো-

বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬	
সবল দিক	• অবক্ষয়িত বন ফিরিয়ে আনা, বন, বনভূমি, বনের বাস্তুতন্ত্র, বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ প্রাধান্য পেয়েছে • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বন, ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে • বনভূমি ও খাসজমি সংক্রান্ত জটিলতা ও সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে • বনের সীমানা নির্ধারণ প্রাধান্য পেয়েছে • বন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনাধীন বনভূমি বন্দোবস্ত প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে • সকল ধরনের বনায়নে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণ ও আগ্রাসি প্রজাতি পরিহারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে • বনের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি বন বিভাগের অনুকূলে অধিগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে • প্রাকৃতিক বন বনবিরুদ্ধ কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ করার বিধান রয়েছে • গাছ কাটার ক্ষেত্রে অনুমতির বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে • গাছ কাটার অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে ক্ষতিপূরণ বনায়নের বিধান রাখা হয়েছে
দুর্বল দিক	• আইনটি নতুন বিধায় এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের অভাব রয়েছে • বিদ্যমান প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতা আইনটি কাগুজে আইনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে

দুর্বল দিক	• আইন প্রয়োগকারী জনবল ও তদারকি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা আইন বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করার আশঙ্কা রয়েছে। • বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প, প্রভাবশালী চক্র ও প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলার বিরুদ্ধে এ আইনে বর্ণিত শাস্তি ও জরিমানা অনেকটাই দায়সারা প্রকৃতির • গাছ কাটার অনুমোদন প্রতিক্রিয়ায় ৩০ দিন সময়ক্ষেপণের বিধান অবৈধ বন ও বৃক্ষ নিধনকে ত্বরান্বিত করতে পারে • গাছ কাটার পূর্বানুমোদনের পাশাপাশি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান জরুরি যা এ আইনে অনুপস্থিত • বিপদাপন্ন ও নিষিদ্ধ প্রজাতির তালিকা আইনে তফসিল আকারে প্রদান না করে গেজেটের উপর ছেড়ে দেওয়া আইনের দ্রুত বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করবে

বন আইন, ১৯২৭	
সবল দিক	• অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ, প্রগতিশীল এবং টেকসই একটি বিধান বর্ণিত হয়েছে ধারা ২৮ এ যার মাধ্যমে গ্রামবন হিসেবে বন ব্যবস্থাপনার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে কোন সংরক্ষিত বনে সরকারের অধিকার যে কোন গ্রাম সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করার এবং তা বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন ফিরিয়ে আনা সম্ভব • সংরক্ষিত বনে জনগণের প্রথাগত অধিকার যথা- ভূমি ও চাষাবাদের, জুম চাষের, গোচারণের, বনজ দ্রব্যের, চলাচলের) এবং পানি প্রাপ্তির অধিকার সংক্রান্ত সকল দাবি নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে। • সংরক্ষিত বনের ভেতর রাস্তা বা পানি প্রবাহ বন্ধ করার পূর্বে বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে

দুর্বল দিক	• বন সংরক্ষণ নয় বরং বন সংক্রান্ত প্রচলিত বিভিন্ন বিধান একত্রিত করা, বনজ দ্রব্যের পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং রাজস্ব আদায় এ আইনের উদ্দেশ্য • ১৯৯০ এবং ২০০০ সালে এ আইন দু'বার পরিবর্তিত হয়েছে যা প্রগতিশীল কোন মূল্যবোধকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি বরং সামাজিক বনায়ন কর্মকাণ্ডকে আইনগত বৈধতা প্রদানই ছিল এ সংশোধনীর মূল প্রতিপাদ্য • বিভিন্ন বনকে সংরক্ষিত ও রক্ষিত ঘোষণার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি বেশ দীর্ঘ এবং সকল ক্ষেত্রে অস্পষ্ট • সংরক্ষিত এবং রক্ষিত বন সংক্রান্ত বিধানগুলোতে বন রক্ষায় লিপিবদ্ধ নিষিদ্ধ কার্যক্রমের অধিকাংশই বননির্ভর জনগোষ্ঠীর অধিকার • বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট নয় এবং বন অধিদপ্তরকে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে • সরকার বন রক্ষায় জনগণের অংশগ্রহণের কথা বললেও এযাবৎকাল ধারা ২৮ এর অধীনে কোন গ্রামবন বিধি প্রণয়ন করেনি • ১৯২৭ সালের আইনে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে বন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই বন অপরাধে জড়িত সন্দেহে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে। তবে গ্রেফতার এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের নামে হয়রানিমূলক আইনি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কোন বিধান এ আইনে নেই • আইনের অধীনে কোন বন কর্মকর্তা সরকারের অনুমতি ব্যতীত বনজ দ্রব্য সংক্রান্ত কোন ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না মর্মে বিধান থাকলেও এ বিধানের ব্যত্যয়ের শাস্তি আইনে উল্লেখ নেই

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬	
সবল দিক	• বন্যপ্রাণী সুরক্ষার জন্য বন বিভাগের অধীনে বন্যপ্রাণী শাখা নামে একটি শাখা এবং বন্যপ্রাণীর উদ্ধার, পরিচর্যা ও সংরক্ষণের জন্য একটি 'বন্যপ্রাণী ট্রাস্ট তহবিল' ও বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের বিধান • বন্যপ্রাণীর কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা কেন্দ্র ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধান • বাঘ বা হাতি শিকারের অপরাধের শাস্তি বৃদ্ধি • সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর বিজ্ঞাপন এবং ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিধান; • বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য; • অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের সীমানা নির্ধারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক; • অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ, এবং • প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান।
দুর্বল দিক	• সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর চোরাচালান বন্ধ করার জন্য বন বিভাগের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাব রয়েছে • বন কর্মকর্তাদের একচ্ছত্র গ্রেফতারের ক্ষমতা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হতে পারে • আইনটি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য বন বিভাগে পর্যাপ্ত আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে • বনাঞ্চল এলাকার মানুষের মধ্যে বন্যপ্রাণী শিকারের শাস্তির বিধান সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা অভাব রয়েছে

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭	
সবল দিক	• সংরক্ষণধর্মী উদ্দেশ্য এবং জীববৈচিত্র্য কনভেনশন, ১৯৯২ এর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ • স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও জীবসম্পদের ব্যবহারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে • জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণার বিধান রয়েছে • জীবসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে • বিপন্ন প্রাণী বা জীবসম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে • সাত স্তরের কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে
দুর্বল দিক	• বাস্তবায়ন ও প্রয়োগহীনতা • বিভিন্ন স্তরের কমিটির গঠন করা হলেও কমিটিগুলো অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়; • জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণার বিধান থাকলেও অদ্যবধি কোন এলাকাকে এরূপ স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি • বিপন্ন প্রাণী বা জীবসম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম বন্ধে নিষ্ক্রিয়তা;
চ্যালেঞ্জসমূহ	• বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা বন ব্যবস্থাপনা ও বন প্রশাসন পরিচালনা • আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব ও উদাসীনতা • বন অধিদপ্তরের দক্ষ ও পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব • সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা • রাজনৈতিক প্রভাব • প্রভাবশালীদের আগ্রাসন • বন ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত বনবাসীদের সম্পৃক্ত না করা • বন ধ্বংসরোধে শিথিলতা

৩.৩ প্রচলিত বন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে প্রচলিত বন ব্যবস্থাপনাসমূহ মূলত উল্লিখিত নীতি ও আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দেশে বর্তমানে সবচেয়ে প্রচলিত বন ব্যবস্থাপনা মডেল হচ্ছে সামাজিক বনায়ন। তবে যথাযথ সফলতা না পেলেও সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে দেশব্যাপী। বনবিভাগ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় যার লক্ষ্য বন সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন।

বন ব্যবস্থাপনার একটি প্রচলিত মডেল সহ-ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি মডেল সহ-ব্যবস্থাপনা আইনি স্বীকৃতি পায়। সম্প্রতি প্রণীত আইনেও সহ-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনে বলা হয়েছে সরকার বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহারের প্রয়োজনে বন অধিদপ্তর বনে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে পারবে। আইনে আরও বলা হয়েছে এ লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বিধি ও নির্দেশনা প্রণয়ন করবে। তবে, আইনগতভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তিরও বহু আগে বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং United States Agency for International Development (USAID) এর যৌথ উদ্যোগে ২০০৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা শুরু করে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (২০০৪-২০০৮) এর মাধ্যমে ৫টি রক্ষিত এলাকায়, সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বা আইপ্যাক প্রকল্প (২০০৮-২০১৩) এর মাধ্যমে ১৮টি রক্ষিত এলাকায় এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকা বা ক্রেল প্রকল্প (২০১৩-২০১৮) এর মাধ্যমে ২২টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। বিশ্বব্যংকের অর্থায়নে চলমান টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের (২০১৯-২০২৩) আওতায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়নের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদান করেছে। এ বিধিমালায় সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যা অনুমোদন করবে সাধারণ কমিটি। এছাড়া জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে নির্বাহী কমিটি এবং পরামর্শ প্রদান করবে সাধারণ কমিটি। নির্বাহী কমিটির অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে স্থানীয় অংশীজনদের উদ্বুদ্ধকরণ; রক্ষিত এলাকায় টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম

গ্রহণ; কমিউনিটি টহল দলের সহায়তায় রক্ষিত এলাকায় টহলের ব্যবস্থা গ্রহণ; কমিউনিটি টহল দলের উন্নয়ন ও সম্মানী প্রদানসহ বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমের অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; রক্ষিত এলাকা ও এর সংলগ্ন এলাকায় টেকসই উন্নয়নের নিমিত্ত এ বিধিমালায় বর্ণিত উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ; বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বা স্থাপিত অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; বাফার জোন ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে বন সৃজন ও সৃজিত বনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম তদারকি; রক্ষিত এলাকা ও এর সংলগ্ন এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন; রক্ষিত এলাকা ও সংলগ্ন এলাকার মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বন অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান; জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে রেখে সঙ্গতি রেখে অভিযোজনের বিষয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রচারণামূলক কর্মসূচি পরিচালনা; বন রক্ষার কাজে নিয়োজিত বা বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ পেতে আবেদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সহায়তা প্রদান; রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ; পিপলস্ ফোরাম, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এবং কমিউনিটি টহল দলের সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান; অবৈধ দখল রোধে এবং অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারে বন অধিদপ্তরকে সহযোগিতা প্রদান; করিডোর চিহ্নিতকরণ এবং বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বন অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান; সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব-নিরীক্ষা নিশ্চিতকরণ; রক্ষিত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এ বিধিমালায় বননির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে পিপলস্ ফোরাম, গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম ও কমিউনিটি টহল দল ইত্যাদির গঠন ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ বিধিমালায় সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধারের বিষয়টি তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি।

সহ-ব্যবস্থাপনা একটি আলোচিত ও সমালোচিত মডেল। রহিত বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৩৮) এ সহ-ব্যবস্থাপনার যে সংজ্ঞা ছিল, তা যে কেবল ভাষাগত কারণেই ভুল তা নয় বরং এটি সকল মহলে ব্যাপক আলোচিত হয়নি, বরং এ বিষয়ে সরকারের গোপনীয়তার কারণে সমালোচিত হয়েছে। অধিকন্তু বিশ্বের কোথাও প্রাকৃতিক বনে এমন ব্যবস্থাপনার প্রচলন দেখা যায় না। ইতোমধ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রাকৃতিক বন রক্ষায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেনি। বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিবেদনে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব, প্রকল্প নির্ভরতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দুর্বলতাকে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সফলতার অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে সহ-ব্যবস্থাপনার নামে রক্ষিত বন এলাকায় ব্যাপক বন বিরুদ্ধ কার্যক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেমন: টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে সহ-ব্যবস্থাপনায় দুর্বল কর্মদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেখানে বনজ সম্পদ আহরণ অব্যাহত ছিল, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা বজায় থাকা অবস্থায় বনাঞ্চল অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। রিমোট সেন্সিং এবং জিআইএস-এর সাহায্যে

প্রাপ্ত তথ্য স্কেচ থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের প্রধান সহ-ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত রক্ষিত বন এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বনভূমির ক্ষতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রচলিতভাবে পরিচালিত বনের তুলনায় সহ-ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বনগুলোতে বনভূমির হ্রাসের প্রবণতা বেশি দেখা গেছে। দেশের কিছু সহ-ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত রক্ষিত বন এলাকায় বিদেশি প্রজাতির গাছ প্রভাব বিস্তার করতে দেখা গেছে। অংশীজন নির্বাচনেও রয়েছে নানা অনিয়মের চিত্র। সকল ক্ষমতা বন বিভাগের অধীন রেখে কোনও বন ব্যবস্থাপনাই সফলতা আনতে পারবে না। তাই সহ-ব্যবস্থাপনাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সহ-ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুলনার কয়রা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের মোহাম্মদ শাহ আলমের সাথে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলা হয়। এই সাক্ষাৎকারটি উপকূলীয় বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সুন্দরবনের পাশেই বসবাসকারী জনগোষ্ঠী প্রায় প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। মোহাম্মদ শাহ আলম সাইক্লোন আইলা, আম্পান, ইয়াস ও রেমালের মতো ভয়াবহ দুর্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন যে সুন্দরবনই এই অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। ঝড়ের তীব্রতা কমানো এবং প্রাণ ও সম্পদ রক্ষায় সুন্দরবনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়রার মানুষের জন্য সুন্দরবন কেবল একটি বন নয়, বরং টিকে থাকার অবলম্বন।

মোহাম্মদ শাহ আলম
গ্রাম: গোবিন্দপুর, ইউনিয়ন: মহারাজপুর, উপজেলা: কয়রা

মোহাম্মদ শাহ আলম উল্লেখ করেন যে স্থানীয় জনগণের জীবিকা সুন্দরবনের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। অনেকেই মাছ ধরা, কাঁকড়া সংগ্রহ, মধু আহরণসহ বিভিন্ন বনজ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বন বিভাগ থেকে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী পারমিট নিতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে সহ-ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে স্থানীয় জনগণ ও বন বিভাগ যৌথভাবে বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। তাত্ত্বিকভাবে এ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও জীবিকার মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে শাহ আলম সহ-ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন নিয়ে কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কিছু এলাকায় কমিটিগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং কোথাও কোথাও রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। তিনি অভিযোগ করেন যে দরিদ্র বননির্ভর মানুষদের কাছ থেকে কখনও কখনও অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয় বা অনানুষ্ঠানিক মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বাধ্য করা হয়। এ ধরনের অনিয়ম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দুর্বল করে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সাক্ষাৎকারে অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার এবং প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরার মতো সংরক্ষণসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের কথাও উঠে এসেছে। যদিও বন বিভাগ, স্থানীয় সংগঠন ও নাগরিক সমাজের যৌথ উদ্যোগে কিছু ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তবুও দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার জন্য আরও বিস্তৃত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় সংরক্ষণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হতে পারে।

সার্বিকভাবে সাক্ষাৎকার থেকে প্রতীয়মান হয় যে সহ-ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ হলেও এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সংস্কার ও সক্রিয় তদারকি প্রয়োজন। সুন্দরবন রক্ষা করা মানে কয়রার মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করা। তাই স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এ অঞ্চলের পরিবেশগত স্থায়িত্বতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৪ উপকূলীয় বন রক্ষায় আদালতের নির্দেশ

উপকূলীয় বনের বিরুদ্ধ ব্যবহার রোধে ও বন রক্ষায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত এগিয়ে এসেছেন। মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট উপকূলীয় বন রক্ষায় ধারাবাহিকভাবে প্রদান করেছেন রায় ও আদেশ। নিম্নে মহামান্য আদালতের কতিপয় আদেশ তুলে ধরা হলো:

- সীতাকুণ্ডে উপকূলীয় বনের জায়গায় জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ড স্থাপনে সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিলপূর্বক ইয়ার্ডগুলো সরিয়ে সেখানে বনায়ন করা[৯২];
- সমুদ্র সিকস্তি ভূমি যা জোয়ারের সময় নিয়মিত প্লাবিত হয় তা বন্দোবস্তযোগ্য নয় বিধায় সেখানে বনায়ন করা[৯৩];
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং বন বিভাগ কর্তৃক উপকূলীয় বনায়ন সংক্রান্ত সকল কার্যপত্র অনুযায়ী বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং রোপিত বনের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা[৯৪];

[৯২] সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১৪৫৭/২০০৯ ও ১৪৫৮/২০০৯; আদেশ ০৬ অক্টোবর, ২০১৩

[৯৩] রিট মামলা নং ৮৮৭/২০১০; রায় ১৮ আগস্ট, ২০১০

[৯৪] রিট মামলা নং ১২০৭/২০০৯; রায় ৯ সেপ্টেম্বর,২০০৯

- উপকূলীয় বন এলাকাকে জাহাজ ভাঙা শিল্পের জন্যে বরাদ্দ দেয়াকে অবৈধ ঘোষণা করা[৯৫];
- কক্সবাজারের ঝিলংজা মৌজার ৫১ একর বনভূমিতে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রদানকৃত বরাদ্দ বাতিল এবং বন এলাকায় বিদ্যমান সকল ধরনের স্থাপনা উচ্ছেদ করা এবং বন ধ্বংস না করা[৯৬];
- কোন বনভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা[৯৭];
- কক্সবাজার জেলার ঝিলংজা মৌজার মোট ৭০০ একর সংরক্ষিত উপকূলীয় বনভূমিতে Bangabandhu Academy of Public Administration প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান[৯৮];
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপকূলীয় বনভূমিতে চিংড়ি চাষ অনুমোদন না করা[৯৯]।

---

[৯৫] রিট মামলা নং ১২০৭/২০০৯ এবং ৪৯০১/২০১৯; রায় ১৫ এপ্রিল, ২০১০ এবং ১৩ মে, ২০১৯

[৯৬] রিট মামলা নং ১১২১০/২০০৬; রায় ৮ জুন, ২০১১

[৯৭] রিট মামলা নং ২৫৬৪/২০১৯; আদেশ ১১ মার্চ, ২০১৯

[৯৮] রিট মামলা নং ৭৬০১/২০২১; আদেশ ১১ অক্টোবর, ২০২১

[৯৯] রিট মামলা নং ৫৭/২০১০; রায় ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

অধ্যায় ৪
বন ধ্বংসের বাস্তব চিত্র

৪.১ আইন ও বাস্তবতা

দেশের অধিকাংশ নীতি, পরিকল্পনায় বনের গুরুত্ব বিবেচনায় বনায়নকে প্রাধান্য দিলেও বন পুনরুদ্ধারে যথাযথ দিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তবে বৃটিশ শাসকদের প্রণীত ১৯২৭ সালের বন আইনের কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে, যেমন: এ আইন অনুযায়ী কোন বনভূমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার পূর্বে প্রথাগত বনবাসীদের অধিকার ও দাবিগুলোর নিষ্পত্তি করতে হবে, আবার এ আইনের ২৮ ধারার বিধানকে কাজে লাগিয়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোনো সংরক্ষিত বনের ব্যবস্থাপনা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করা যেতে পারে। পরিতাপের বিষয় হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন ব্যবস্থাপনায় বনবাসীদের সম্পৃক্ত করা হয় না। ফলশ্রুতিতে, প্রতিবছরই হারিয়ে যাচ্ছে দেশের বনভূমি। বাংলাদেশ জলবায়ু বিষয়ক কপ-২৬ সম্মেলনে "গ্লাসগো লিডার ডিক্লারেশন" এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বন উজাড়রোধে ও নতুন বনায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও তথাকথিত উন্নয়নের নামে বার বার বেছে নেয়া হচ্ছে বনকে, বনে করা হচ্ছে নানান প্রকল্প। সর্বজনস্বীকৃত যে, একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে দেশের মোট ভূমির ২৫% বনভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ বন অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী তা আছে মাত্র ১৫.৫৮%। বনের এ পরিমাণ নিয়ে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পরিসংখ্যান। বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী বন রয়েছে মোট ভূমির ১৪.৫[১০০]%। বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র ২০১৬-২০৩১ অনুযায়ী দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ মোটভূমির প্রায় ১৭.৪%। মনুষ্যসৃষ্ট কর্মকাণ্ড ও বন বিধ্বংসী সিদ্ধান্তের কারণে উপকূলীয় বনসহ দেশের সকল বনভূমি আজ ধ্বংসের মুখে। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে স্বল্প পরিমাণে বিদ্যমান এ বন ধ্বংস ও উজাড়ের হারও কম নয় এ দেশে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর বিবৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশে বার্ষিক বন উজাড়ের হার ২.৬ শতাংশ যা বিশ্বব্যাপী

[১০০] https://data.worldbank.org/country/bangladesh

বন উজাড়ের গড় হারের দ্বিগুণ[১০১]। গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ-এর ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে দেশে প্রাকৃতিক বন উজাড় হয়েছে মোট ১৮,০০০ হেক্টর যার ক্ষতির পরিমাণ ৯.৮ মেগাটন কার্বন নিংসরণের সমান[১০২]। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তথ্যমতে, ২০০২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে প্রাকৃতিক বন কমেছে ৮,৯০০ হেক্টর এবং ২০০১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ কমেছে প্রায় ২৪৬,০০০ হেক্টর বা ১৩ শতাংশ। এ পরিমাণ বৃক্ষাচ্ছাদন রক্ষা করা গেলে অন্তত ১৫০ মেগাটন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঠেকানো যেত। বন ধ্বংসের মূলে রয়েছে বৃটিশ সরকারের রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রণীত বন আইন; বনের পরিমাণ ও সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা; অসামঞ্জস্যপূর্ণ বন নীতি ; সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনিয়ম ও অদক্ষতা; বন ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করা; বনভূমির বিরুদ্ধ ব্যবহার এবং ভ্রান্ত ও বিতর্কিত বনায়ন কর্মসূচি। ধ্বংসের মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাচ্ছে না উপকূলীয় প্রাকৃতিক বন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সৃজিত গ্রিন বেল্ট বা উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী। দেশে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ২৫ বছরে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৫০ শতাংশেরও বেশি ঝাউবন উজাড় হয়ে গেছে[১০৩]। ফলশ্রুতিতে, উপকূলের জনবসতি, ফল-ফসল, প্রাণী, উদ্ভিদ, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য বিপন্ন হচ্ছে মারাত্মক আকারে। উপকূলীয় বন ধ্বংসের পেছনে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়িঘের, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ড তৈরি মূলত দায়ী। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরে চিংড়িঘের নির্মাণের জন্য ৬ হাজার একর প্যারাবন ধ্বংস করা হয়েছে। মার্চ, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত চারমাসে সোনাদিয়ার ৩ হাজার একর প্যারাবন ধ্বংস করে চিংড়িঘের নির্মাণ করা হয়েছে। সোনাদিয়া ও ঘটিভাঙা মৌজার ৮ হাজার একর প্যারাবন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে যা সম্প্রতি বাতিল করা হয়েছে। নিম্নে উপকূলীয় বন ধ্বংসের কতিপয় চিত্র তুলে ধরা হলো:

---

[১০১] the Daily Star title “International Forest Day: Annual deforestation rate in Bangladesh almost double the global average, TIB report says”; 21 March 2021

[১০২] https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/BGD/? category=-forest-change

[১০৩] www.prothomalo.com/bangladesh/দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা-জনবান্ধব-হবে-আর-কত-দিনে

চকোরিয়া সুন্দর বনঃ হারিয়ে যাওয়া এক বনের নাম[১০৪]

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বের কক্সবাজার জেলায় সমুদ্রের কোল ঘেঁষে আরও একটি ম্যানগ্রোভ বন ছিল যা চকোরিয়া সুন্দরবন নামে পরিচিত। ১৯ ডিসেম্বর, ১৯০৩ সালের গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী চকোরিয়া সুন্দরবনের মোট আয়তন ৮৫০৬.৭ হেক্টর (২১, ০২০.৪ একর) যার মধ্যে ৭৪৮৬.৭৭ হেক্টর (১৮,৫০০ একর) সংরক্ষিত এবং ১০২০ হেক্টর (২৫২০.৪৫ একর) রক্ষিত বন। এ বনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় এ বন ধ্বংসের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৯৭৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আদেশের মাধ্যমে ৫৬৩ একর সংরক্ষিত বন ইজারা প্রদান করা হলে। সবচেয়ে বড় ধ্বংস শুরু হয় সরকার যখন স্বল্পসময়ে অধিক মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় বিনা সংকোচে চকোরিয়া সুন্দরবনকে চিংড়ি চাষের স্থান হিসেবে বেছে নেয়। ১৯৮২ সাল থেকে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের জন্য ম্যানগ্রোভ বন কেটে শতাধিক চিংড়ি খামার করা হয় যার প্রতিটির আয়তন প্রায় ১১ একর। দেশের জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ এবং চরণদ্বীপের জেষ্ঠ্য নাগরিকগণের মতে, বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) সেখানে মাছ চাষের প্রকল্প নিয়ে আসে ১৯৮৬ সালে এবং চিংড়ির চাষের জন্য ২৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বনের এলাকায় ৫০০টি চিংড়িঘের হয়। প্রতিটির আয়তন ছিল ১০ একর। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে সমৃদ্ধ বনটি ধীরে ধীরে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। আশির দশকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চোখের সামনে সুন্দরবনের কেওড়া, বাইন ও সুন্দরীগাছ কেটে মাছের ঘের করা হয়েছে। এখন বন বলতে কোনকিছু নেই বরং বনের জায়গায় লবণের মাঠ ও মাছের ঘের তৈরি করা হয়েছে। এ বনের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এ বন বৃক্ষ ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ছিল। ১৯৮২ সালে বনের উত্তর-পশ্চিমাংশের খানিকটা উধাও হয়ে বনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬৫০ একরে। ১৯৯৫ সালে পুরো বন উধাও হয়ে গেছে। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক তাদের প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদনে বলেছে, 'প্রকল্পের ফলে কোন পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দেয়নি; বরং দীর্ঘ মেয়াদে জলাবদ্ধতার মতো সমস্যা মিটেছে। কোনো সুন্দরবন কাটা হয়নি।' পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে এডিবি'র প্রতিবেদনে ৮০০ হেক্টর বন উজাড় হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের

---

[১০৪] "চকোরিয়া সুন্দরবন: যে বনে একটিমাত্র গাছ"; দৈনিক প্রথম আলো; ২৪ জুলাই, ২০২৫

একসময় ঘন চকরিয়া সুন্দরবন এখন লবণ চাষের স্থান। চকরিয়ার বদরখালী ইউনিয়নের লম্বাখালী পাড়া। ছবিঃ জুয়েলশীল, প্রথম আলো।

তথ্যমতে বনটির ভূমির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষপ্রজাতি দেখা যেত। চিংড়ি চাষ, লবণ চাষ এ অঞ্চলে যেমন গাছ নিধনের উৎসব আয়োজন করেছে তেমনি লবণাক্ততা বাড়িয়েছে যা ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের জন্য কাজ করেছে এবং একইসাথে এ অঞ্চলের মাটিকে অন্যান্য ফসল চাষাবাদের অনুপযোগী করে তুলেছে। অধিকন্তু চিংড়ি চাষীরা পুকুর তৈরির জন্য বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিয়েছে, অভ্যন্তরীণ খাল খনন করেছে, যা পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করেছে এবং ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি করেছে। সম্পদের যথেচ্ছ আহরণ এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল যে মানুষ এ বনের বিভিন্ন স্থানে খাঁড়ির মুখে বাঁধ দিয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ করেছে। ফলশ্রুতিতে, জোয়ার-ভাটার যে পরিবেশে ম্যানগ্রোভ প্রজাতি বেঁচে থাকে তা বাঁধের মাধ্যমে স্থির পানিতে শ্বাসরোধ করে মারা হলো। পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে একসময় চারাগুলো পর্যন্ত মরে গেল, নতুন করে গাছ জন্মানোর সুযোগও বন্ধ হয়ে গেল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ইনস্টিটিউটের একজন গবেষকের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, চকোরিয়া সুন্দরবনের বিনাশ গবেষকদের কাছে 'এক বড় পরিবেশগত বিপর্যয়'। এ গবেষকের মতে, ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে কক্সবাজার উপকূলে যে লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ ও সম্পদহানি হয়েছে

তা হয়তো রোধ করা যেত যদি চকোরিয়া সুন্দরবন অক্ষত থাকত। পরিতাপের বিষয় যে চিংড়ি চাষের জন্য এ বন উজাড় করা হয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই সে চিংড়ি চাষ কমতে শুরু করে। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ বন কেটে ফেলার দরুন অণুজীব এবং মাটির গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাওয়াকে চিহ্নিত করেছে।

মিরসরাই উপকূলীয় বনে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা

The newly built dirt road winding through the now flattened mangrove forest in Chattogram's Mirsharai where an economic zone will be established. Photo: Daily Star

মিরসরাই উপকূলীয় বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়তে মিরসরাই উপজেলার সাহেরখালী, ইছাখালী ও মেঘাদিয়া ইউনিয়নের উপকূলীয় অঞ্চলের ২২,৩৩৫ একর বনাঞ্চল বরাদ্দ নেয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। এসব বনাঞ্চলে গেওয়া, বাইন, কেওড়াসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ছিল। বনাঞ্চলে ছিল হরিণ, শিয়াল, মেছোবাঘ, লজ্জাবতি বানর, বেজি, সাপসহ বিভিন্ন ধরণের বন্যপ্রাণী। কিন্তু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে উল্লেখিত উপকূলীয় বনগুলোর সিংহভাগ ধ্বংস করায় বন্যপ্রাণীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে, যারমধ্যে হরিণের সংখ্যা কমেছে উল্লেখ্যযোগ্য হারে। উপকূলীয় এসব বনে প্রায় ১০-১২ হাজার হরিণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর ৮০ শতাংশ কমে গেছে।

উপকূলীয় বন জাহাজভাঙা ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য ইজারা প্রদান

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন ৬২৭ একর খাসজমি উপকূলীয় বনায়নের উদ্দেশ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার ১,৬৫,০০০ একর খাস জমি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে একই মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয় যা পরবর্তীতে বন আইন ১৯২৭-এর ২০ ধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত বন ঘোষণার লক্ষ্যে ৪ ধারায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ৪ ধারায় প্রজ্ঞাপিত এ বনভূমিতে বন বিভাগ সৃজিত বন

বাগান গড়ে তোলে। ২০১৯ সালে জেলা প্রশাসন সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন উত্তর ছলিমপুর মৌজায় বন বিভাগের সৃজিত বনভূমির অংশ হতে ৭.১০ একর সমুদ্র সিকস্তি ভূমি দেখিয়ে জাহাজভাঙা ইয়ার্ড নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইজারা অনুমোদন করে। বন বিভাগের তথ্যমতে, জাহাজভাঙা ইয়ার্ড নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইজারা অনুমোদিত ভূমি বন বিভাগের সদর রেঞ্জের কাট্টলী বন বিটের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে সৃজিত ৪০০ একর ম্যানগ্রোভ বাগানের অংশ যেখানে বর্তমানে ঘন বন রয়েছে। অবশেষে আদালতের মাধ্যমে এর সুরাহা করা হয়।

সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন উত্তর ছলিমপুর মৌজায় বন বিভাগের এ সৃজিত বনভূমি জাহাজভাঙা শিল্প নির্মাণের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল

উপকূলীয় বনভূমিতে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-এর টেকনিক্যাল সেন্টার নির্মাণ

২০২২ সালে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার জঙ্গল খুনিয়াপালং মৌজার ২০ একর সংরক্ষিত বনভূমি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-এর টেকনিক্যাল সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত এ বনভূমি ১৯০৭ সালে সরকারের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত সংরক্ষিত বন। এ সংরক্ষিত বনটি এশীয় বন্যহাতি, বানর, বন্যশুকর, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ও পাখির আবাসস্থল ও বিচরণক্ষেত্র। জঙ্গল খুনিয়াপালং মৌজা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অংশ হওয়ায় এ এলাকাতে প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ এবং ভূমির

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট বা পরিবর্তন হতে পারে এমন সকল কাজ আইনত নিষিদ্ধ। যদিও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উপকূলীয় বনে এ প্রকল্প বাতিল করেছে[১০৫]।

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার জঙ্গল খুনিয়াপালং মৌজার ঘন এ বনভূমি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-এর টেকনিক্যাল সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল

উপকূলীয় বনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ট্রেনিং একাডেমি নির্মাণ

২০২১ সালে কক্সবাজার জেলার ঝিলংজা মৌজার ৭০০ একর বনভূমিকে অকৃষি খাসজমি দেখিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় Bangabandhu Academy of Public Administration প্রতিষ্ঠার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বন্দোবস্তকৃত এ ভূমি সরকার ঘোষিত রক্ষিত বনভূমি যা জাতীয় উদ্যান ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত। এখানে রয়েছে পাহাড় ও ছড়া। এছাড়াও উপকূলীয় বনায়নের আওতায় এখানে প্রায় ১০০ একর সৃজিত বাগান থাকায় এলাকাটি জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। এই রক্ষিত বনে বিভিন্ন দুর্লভ প্রজাতিসহ প্রায় ৫৮ প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে এবং এলাকাটি এশীয় বন্য হাতি, বানর, বন্যশুকর, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ও পাখির আবাসস্থল ও বিচরণক্ষেত্র। আদালতের হস্তক্ষেপে পরবর্তীতে এ উদ্যোগ স্থগিত করা হয়।

[১০৫] "রামুর সংরক্ষিত বনে বাফুফের টেকনিক্যাল সেন্টার নির্মাণ বাতিল"; প্রথম আলো; ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

৪.২ বন রক্ষায় করণীয়

উপকূলীয় বনসহ দেশের সকল বন রক্ষায় প্রচলিত আইন ও নীতি পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে উপকূলীয় বন রক্ষায় আইন ও বন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আশু করণীয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়:

নীতি ও আইন সংক্রান্ত

- সম্প্রতি প্রণীত পরিবেশ ও জনবান্ধব বন নীতি, ২০২৫ এবং বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ এবং বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা ও নিরাপত্তা) আইন এর যথযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- জীববৈচিত্র্য কনভেনশন, ১৯৯২-এর সামঞ্জস্য রেখে বন আইন, ১৯২৭ এর উদ্দেশ্য পরিবর্তন এবং বনকে জাতীয় সম্পদ বিবেচনায় সরকারের জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা না করে জনসাধারণের কল্যাণে এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী রক্ষার স্বার্থে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করাকে উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা;
- উপকূলীয় বন রক্ষা করাকে বন বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে বন আইন, ১৯২৭ এ নির্দিষ্ট বিধান সংযোজন;
- বন ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে বন আইন, ১৯২৭ এর ২৮ ধারার ক্ষমতাবলে অনতিবিলম্বে গ্রামবন বিধিমালা প্রণয়ন ও সে মোতাবেক বন ব্যবস্থাপনা করা;
- বন সংরক্ষণ, বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য আইনগতভাবে নির্ধারণ

বননির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বন, ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত অধিকার সুরক্ষিত রাখা সংক্রান্ত আইনী বিধান অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করা;
- উপকূলীয় বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করে পরিচয়পত্র প্রদান;
- বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী রয়েছে এমন বনকে গ্রামবন ঘোষণা এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে তার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

- উপকূলীয় এলাকায় যেকোন সংরক্ষণমূলক/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের পূর্বে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর স্বাধীন এবং সচেতন মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা;
- উপকূলীয় বন ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে ও কার্যক্রমে বননির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

উপকূলীয় বন সংরক্ষণ সংক্রান্ত

- উপকূলীয় বনভূমিতে বিদ্যামান সকল অবৈধ স্থাপনা ও দখলদার উচ্ছেদে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- উপকূলীয় বনে আইনি কাঠামো দ্বারা সমর্থিত নয় এমন সকল কর্মসূচি/প্রস্তাবনা/প্রকল্প জনমত যাচাই সাপেক্ষে সংশোধন বা বাতিল করা;
- প্রভাবশালীদের হাত থেকে উপকূলীয় বন পুনরুদ্ধার করা এবং দেশের সকল বনের আইনগত সীমানা ও সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা;
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন থাকা উপকূলীয় বন বনায়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- বনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর ব্যাপক প্রসার ঘটানো এবং এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বাজেট সংকুলান করা;
- উপকূলীয় ভূমি প্রশাসন ও বন অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা:
- উপকূলীয় বন ধ্বংসকারী চিংড়ি ও লবণ চাষ নিষিদ্ধ করে বন আইনসমূহে নতুন বিধান সংযোজন করা;
- উপকূলীয় প্রাকৃতিক বন ও সৃজিত বাগান ধ্বংসের সাথে জড়িত প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি প্রদান করা;
- ইতোমধ্যে উজাড় হয়ে যাওয়া উপকূলীয় বন পুনরুদ্ধারে স্থানীয় ও দেশীয় বৃক্ষরোপণ এবং চকরিয়া ও রামপুরা এলাকায় বিদ্যমান বিরল প্রজাতির বৃক্ষ সংরক্ষণ করা;
- উপকূলীয় অনুর্বর ভূমিতে দেশীয় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মাটির স্থিতিশীলতা ও পরিবেশের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা;

- কক্সবাজার পৌরসভার সমুদ্র তীরবর্তী নো-ডেভেলপমেন্ট জোনের ৩০০ মিটার ও পৌরসভা বহির্ভূত নিয়ন্ত্রিত জোনের ৫০০ মিটার এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ঝাউ বৃক্ষরোপণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- খুলনা উপকূলীয় অঞ্চলের 'মুণ্ডা' কমিউনিটির সাংস্কৃতিক মূল্য বহনকারী 'করন" বৃক্ষকে পবিত্র বা স্মারক বৃক্ষ ঘোষণা করা ও সে মোতাবেক সংরক্ষণ করা;

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

- সহ-ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে টেকসই করতে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা বন বিভাগের অধীন না রেখে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর উপর আরোপ করা;
- প্রাকৃতিক বনে সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহণ না করে পতিত জমিতে বা অবক্ষয়িত বনে এমন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ে আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা এবং বনে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিকাজ অনুমোদন না করা;
- উপকূলীয় বনে অংশগ্রহণমূলক বা সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অংশীজন নির্বাচন, স্থান নির্বাচন, প্রজাতি নির্বাচন ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে আমূল পরিবর্তন আনা;
- প্রাকৃতিক বনে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত/গৃহীত সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মেয়াদান্তে রোপিত বৃক্ষ (যদি বৃক্ষরাজি প্রাকৃতিক বন উপযোগী হয়) না কেটে ভিন্নভাবে উপকারভোগীদের প্রাপ্য প্রদান করা;
- বনের প্রতিবেশ, বনবাসী ও বন্যপ্রাণীর স্বার্থে যেসকল প্রাকৃতিক বনে বাস্তবায়িত/গৃহীত সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অধীন ভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে মেয়াদান্তে তা কেটে ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধার করা।

শেষকথা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততার বিস্তারের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় বনাঞ্চল আজ বহুমাত্রিক ঝুঁকির মুখোমুখি। উপকূলীয় বন শুধু জীববৈচিত্র্যের আশ্রয়স্থল নয়; এটি উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাকৃতিক সুরক্ষাবলয় হিসেবে এবং দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বাস্তবতায় উপকূলীয় বন ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে তা যুগোপযোগী ও কার্যকরভাবে সংস্কার করা জরুরি। বিশেষত বন সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বিত নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং জলবায়ু সহনশীল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন সময়ের দাবি। উপকূলীয় বন সংরক্ষণকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, জলবায়ু অভিযোজন কৌশল এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ২৭ শতাংশে উন্নীত করার যে জাতীয় অঙ্গীকার করেছে, তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপকূলীয় বন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একইসাথে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশের ওপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই বিশেষ দায়িত্ব বর্তায়। তাই বন আইন ও নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করা অপরিহার্য। উপকূলীয় বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে একদিকে যেমন কার্বন শোষণ বৃদ্ধি, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিকাশে অবদান রাখা সম্ভব হবে, অন্যদিকে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, পরিবেশগত নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই ও সহনশীল উপকূল নিশ্চিত করা যাবে। ফলে উপকূলীয় বন ব্যবস্থাপনাকে কেবল বন খাতের একটি বিষয় হিসেবে নয়, বরং জাতীয় পরিবেশ, জলবায়ু ও উন্নয়ন নীতির একটি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

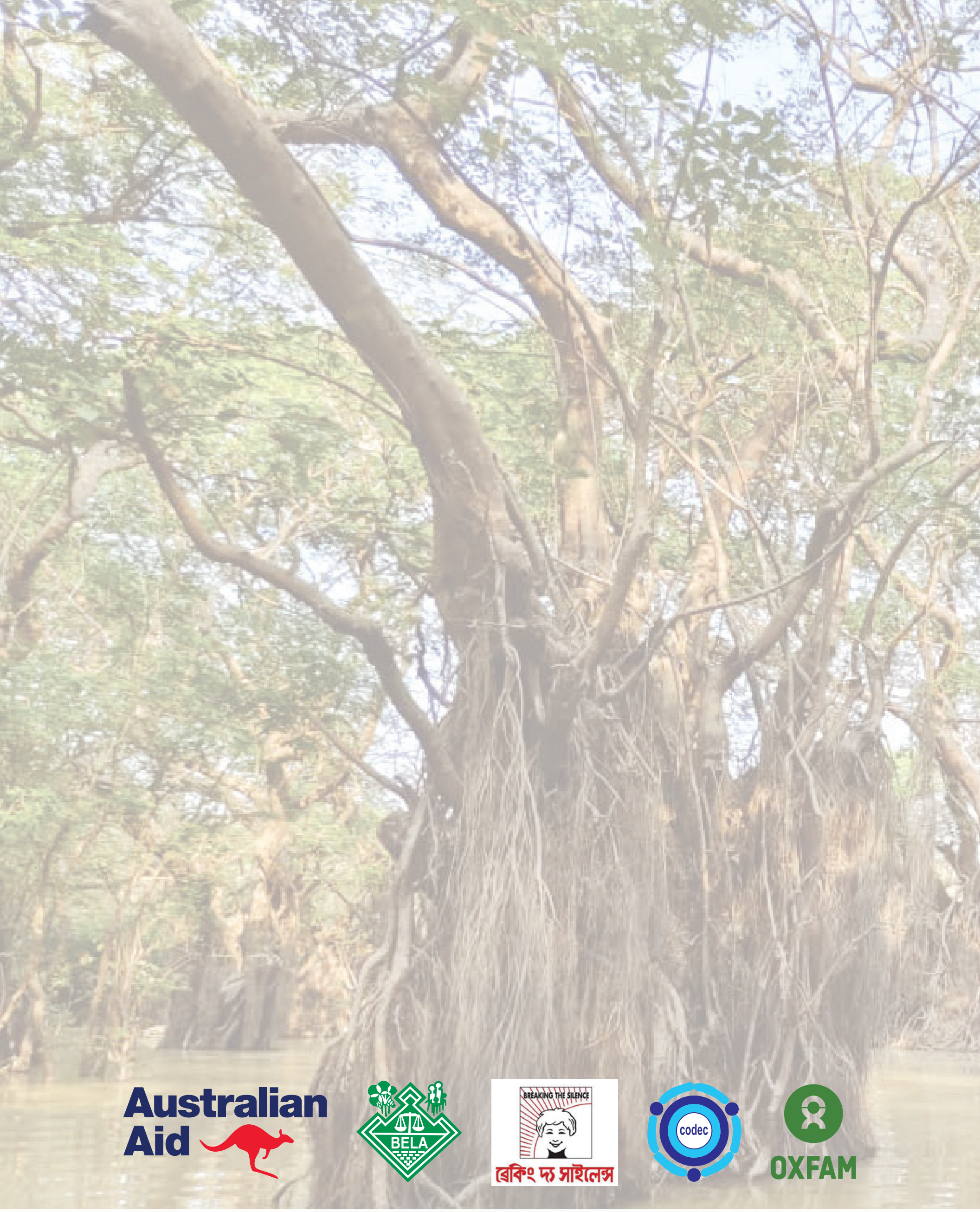

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)
বাড়ি নং ১৫/এ (৫ম তলা), সড়ক নং ৩, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৫৮৬১ ৪২৮৩, ৫৮৬১ ০৩১১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৫৮৬১ ২৯৫৭
E-mail: bela@bangla.net, Website: www.belabangla.org